জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ

পাতালরেল চালু হওয়ায় বেশ সুবিধা হয়েছে অবন্তীর। হোটেল থেকে বেরিয়ে দু পা হাঁটলেই স্টেশনের গেট। দশ মিনিটেই পার্ক স্ট্রীট। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠার সময় অবশ্য পা টনটন করে। তারপর মিনিট পাঁচ এক হাঁটলেই অফিসের দরজা। আগে বাসের ভিড় ঠেলে উঠতেই প্রাণ জেরবার হত। কলকাতা মেয়েদের জন্য নয় এই রকম ভাবসাব নিয়ে অফিসের বাবুরা যাতায়াত করেন। অফিসে যখন পৌছাত তখন প্রায় ছিবড়ে হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

আজ চেয়ারে বসামাত্র বেয়ারা এসে বলল, 'দিদি এসে গেছেন! আপনার ফোন।

অবন্তী অবাক হলো। তাকে ফোন করার কলকাতায় কেউ আছে নাকি? মাঝে মাঝে হেড অফিস থেকে ফোনে রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলে। ফোন আসতো বছর পাঁচেক আগেও যখন তার চুলে রুপোলি ছাপ পড়েনি। অবন্তী উঠলো।

'হ্যালো!'

'কে ? দিদি?

'হ্যাঁ।'

'আমি হেমন্ত বলছি। তুই এখনই চলে আয়। মা আজ সকালে মারা গেছে।'

'মা ?' গলায় কিছু আটকে গেছে অবন্তীর।

'হার্ট অ্যাটাক। ছাড়ছি অনেক বিল উঠবে।'

কয়েক সেকেন্ড রিসিভার ধরে দাড়িয়ে রইলো অবন্তী। মা মরে গেল! ছোটখাটো চেহারার রোগা মানুষটার মুখ মনে পড়ল। সহকর্মী অমীয়বাবু পাশে দাঁড়ালেন। 'কি হয়েছে মিস সেন'?

রিসিভার নামিয়ে মাথা নাড়ল অবন্তী। তারপর ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল। সে যখন বড় মেয়ে তখন মানুষটার বয়স হয়েছিল সত্তর। সতেরো বছরে যার বিয়ে তার প্রথম সন্তান হয়েছিলো কুড়িতে।কিন্তু তার এখন কী করা উচিৎ? মা মরে গেলে ছেলেমেয়েরা তো চেঁচিয়ে কাঁদে। তার তো এখন কান্নাকাটি করা উচিৎ। সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা থম্ ধরা অনুভূতি ছাড়া কিছুই হচ্ছে না কেন? কান্না আসছে যে না তার। চোখ বন্ধ করল অবন্তী। তখন কত বয়স, বড় জোর আট! মা খুব রেগে গিয়ে বলেছিল আমি যেদিন মরে যাব সেদিন বুঝবি, কত ধানে কত চাল। আজ সেই দিন কি? হিসেবটা জানা নেই তবে জেনে গিয়েছে এতদিনে, সব ধানে চাল থাকে না।

'অবন্তী , কী হয়েছে ? শ্রাবণী পাশে এসে দাঁড়ালো।

অবন্তী বলল আমাকে এখনই বর্ধমানে যেতে হবে ভাই।'

শ্রাবণী চোখ ছোট করল , কোন খারাপ খবর?'

'হ্যাঁ। মা মারা গিয়েছে।' অবন্তী উঠে দাঁড়ালো । তার সম্পর্কে এ অফিসের যে কজন সামান্য কিছু জানে তাদের মধ্যে শ্রাবণী বেশি ঘনিষ্ঠ।

শ্রাবণী বলল তুমি একা যাবে?'

'বারে ! চিরকাল একাই যাওয়া আসা করছি আজ কাউকে লাগবে কেন? অবন্তী শান্ত গলায় কথাগুলো বলে অফিসারের ঘরে ঢুকল। খবরটা শোনামাত্র ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে ছুটি মঞ্জুর করলেন যেন মনে হলো অবন্তীর খুব ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে, সরিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যান।

ভরদুপুরে হোস্টেলে ফিরে এলে কাজের লোকটি যেভাবে কারণ জানতে চায় তা প্রায় কৈফিয়ত চাওয়ার মতো। এই হোস্টেলে সিঙ্গেল বেড রুম দুটো। বছর দুয়েক হলো তার একটা অবন্তী পেয়েছে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল সে। ভাই বলেছে এখনই চলে যেতে। নিশ্চয়ই মায়ের শরীর ওরা রেখে দিয়েছে তার জন্যে। টুকটাক জিনিস, জামাকাপড় আর কিছু টাকা ব্যাগে ভরে নিল অবন্তী। অফিসে যাওয়ার সময় তিনতলার এই ঘরের জানালাটা সে খোলা রেখেই

যায়। এখন বন্ধ করতে গিয়ে নজর গেল। উল্টোদিকের একটা লম্বা রাধাচুড়া গাছের মগডালে বাসা করে ডিম পেড়েছিল কাকিনী। সেই ডিম ফুটে তিনটা বাচ্চা বেরিয়েছিল কদিন আগে। এই মুহূর্তে কাকিনী এসে পাশের ডালে বসামাত্র তিনটে খুদে একসঙ্গে মুখ হাঁ করে প্রায় লাফাতে শুরু করল। কাকিনী সন্তর্পণে তাদের হাঁ করা মুখে নিজের মুখের খাদ্যবস্তু ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

হঠাৎ শরীরে কাঁপুনি এল। তারপর ঝড়ের বেগে সমস্ত শিরা-উপশিরা নিংড়ে কান্না ছুটে এল চোখে। উপুর হয়ে বালিশে মুখ চেপেও নিজেকে সামলাতে পারছিল না অবন্তী। বুকের ভেতর বাতাস যেন থমকে গেল আচমকা। তারপর যেভাবে গুন টেনে টেনে মাঝি স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা নিয়ে যায় সেইভাবে সে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। শরীর এবং শরীরের অনুভূতিগুলো একদিকে, আর মন সজাগ হয় অন্যদিকে। শরীরের অনুভূতিগুলোকে যদি আবেগ বলা যায় তা হলে তার জনক কখনও কখনও মন নয় এই সত্য আজ অবন্তী আবিষ্কার করল।

এই পরিচিত রাস্তা, কতবার যাওয়া আসা করা, অথচ আজ যেন কি রকম অচেনা লাগছিল। এমনকি প্রায় বিকেলের যে ট্রেনটা তাকে বর্ধমানে পৌঁছে দিত সেটাও নির্জন। রিকশায় ওঠার পর রিকশাওয়ালা বলল, 'আজকাল কি আসেন না দিদি? অনেকদিন পরে দেখলাম।'

অবন্তী মাথা নাড়লো। লোকটির রিকশায় সে আগেও চড়েছে অথচ এই মুহূর্তে সে কথা মনে করতে পরছে না।

বাড়ির সামনে ভিড় নেই। মায়ের বয়স হয়েছিল সত্তর। পাড়ায় মাকে চিনত অনেকেই। তা হলে ভিড় নেই কেন? মফস্বলের কেউ মারা গেলেই বাড়ির সামনে ভিড় হয়ে যায়। কান্না দেখতে অনেকেরই মজা লাগে।

রিকশা থেকে নেমে বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই রত্না ছুটে এল, 'এতক্ষণে তোমার আসার সময় হলো দিদি। সেই কোন সকালে তিনি গেছেন তবু তোমার ভাই বলে যাচ্ছেন, দিদি না এলে দাহ হবে না। খবরও দিয়েছে সকালেই। তুমি দিন ফুরিয়ে এলে ছিছিছি।'

অবন্তী বলতে পারল, 'ওরা কোথায়?'

'কোথায় আবার? মড়া নিয়ে লোক কোথায় যায়?'

অবন্তী ভাই-এর বউ-এর দিকে তাকালো। প্রথম যখন এসেছিল তখন সবসময় নুয়ে থাকত, মা বলত বোবা নাকি! মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত না। যতদিন ভয় ছিল ততদিন লজ্জা মুখোশের কাজ করত।

এখন কথা বলতে ইচ্ছে করল না। রিকশাওয়ালা এসব সংলাপ মন দিয়ে শুনছিল। অবন্তী আবার রিকশায় উঠে বললো, শ্মশানে চলো।'

রত্না বলল, 'ওদের তো ফিরে আসার সময় হলো, গিয়ে কি করবে?'

অবন্তী 'চলো' বলতেই প্যাডেলে চাপ দিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, 'কে মারা গিয়েছেন দিদি? ওনার মা?'

অবন্তী জবাব দিল না। তার এখন কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না। দুপাশে দোকান বাড়ি-ঘর ছেড়ে রিকশা এগিয়ে যাচ্ছিল। এই পথ দিয়ে সে গিয়েছিল অনেক কাল আগে, বাবার মৃতদেহ নিয়ে।

পৃথিবীর নিয়ম বড় অদ্ভুত। যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাস সে-ই তোমার দুখেঃর কারণ হবে। আজকে অবন্তী যেখানে সেটা তো ওই মানুষটার জন্য। যে মানুষটা তাকে ভালোবেসেছিল, ভালোবাসতে শিখিয়েছিল।

'দিদি, এসে গেছি।'

'তুমি দাঁড়াও।'

'দাঁড়াতে আপত্তি নেই দিদি তবে গরিবকে মনে রাখবেন।

ঘুরে দেখল অবন্তী, 'তোমার এখন পর্যন্ত কত ভাড়া হয়েছে?'

'পনেরো টাকা।'

ব্যাগ খুলে টাকাটা বেড় করে এগিয়ে ধরলো অবন্তী।

রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই যে বললেন দাঁড়াতে?'

টাকাটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল অবন্তী।

আজ বর্ধমানের অনেক মানুষ একসঙ্গে মারা গিয়েছেন। শ্মশানে এনে তাদের শুইয়ে রাখা হয়েছে, ডাক এলেই নিয়ে যাওয়া হবে দাহের জন্য। ছেলেমেয়ে স্ত্রী বা স্বামী তাদের মৃত শরীর ছুঁয়ে বসে আছে। এসময় নাকি মৃতদেহকে একা রাখতে নেই। অর্থাৎ যিনি মারা গেছেন তিনি চলে যাননি। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এগিয়ে দিতে কাউকে অথবা অনেককে পাশে থাকতে হচ্ছে।

অবন্তী চারপাশ তাকাল। দুজন স্ত্রী-মৃতদেহের মুখের সঙ্গে মায়ের কোন মিল নেই। ভাইরা অথবা পাড়ার কাউকে চোখে পড়ছে না। তা হলে ভাই-এর বউ ঠিকই বলেছে, ওরা কাজ শেষ করে ফিরে গেছে।

'আপনি?'

শব্দটা শুনে ঘুরে দাঁড়াল অবন্তী। পাড়ারই ছেলে, ছোট ভাই-এর বন্ধু।

ছেলেটি বলল, 'এখানে না, মাসিমাকে চিতায় শোয়ানো হচ্ছে, ওদিকে। আসুন।'

ব্যস্তভাবে ছেলেটি পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

মুখাগ্নি করছে বড় ভাই। মায়ের মুখ দেখা যাচ্ছে না। জ্বলে উঠল আগুন। অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে রইল অবন্তী। তার নিজের মা, যে মায়ের শরীর তাকে পৃথিবীতে এনেছিল, সেই মা জ্বলে-পুড়ে ছাই হচ্ছে। অথচ এখন তার কান্না আসছে না। ছোট ভাই ছুটে গেল মায়ের চিতার দিকে, 'মা, মাগো, ক্ষমা করো আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি মা।'

গলার স্বর জড়ানো। পা স্থির নেই। তাকে আটকালো যে বন্ধুরা তাদেরও এক অবস্থা। জড়ানো গলায় তারা বলছে, 'এই বসন্ত ঠিক আছে, চল বাড়ি চল। অ্যাই বসন্ত।'

বসন্ত বলছে, না সত্যি কথা বলতে দে আমাকে। আমি বা দাদা কেউ কিচ্ছু করিনি মায়ের জন্য। মাল খেয়েছ বলছি না, হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি কথা বলছি।' বলে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বন্ধুরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল চোখের আড়ালে। যে ছেলেটি পথ দেখিয়ে এনেছিল অবন্তীকে সে এবার বড় ভাই হেমন্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খবরটা দিল। সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত এগিয়ে এল, 'মা চলে গেলরে দিদি।'

হেমন্তের গলা পরিষ্কার। অবন্তী চিতা থেকে চোখ সরাল না।

'বাড়িতে গিয়েছিলি?' হেমন্ত নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'সবাই বলল দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই নিয়ে আসতে হল।'

বিসর্জন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চলল। বসন্ত তার কাছে ঘেঁসছে না, দূরে দূরে থাকছে। বাবা মারা যাওয়ার সময় ওর বয়স ছিল আট।

জায়গাটা নির্জন। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনকক্ষণ। অবন্তী একটা উঁচু বাঁধানো জায়গায় বসেছিল পাথরের মতো। হেমন্ত পাশে এসে বসল। অশৌচের পোশাক তার পরনে। হেমন্ত বলল, 'বাড়িতে ব্যাগ রেখে আসিস নি কেন?'

অবন্তী বলল, 'রাখার সুযোগ পাইনি।'

'কেন রত্নার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'হয়েছে।'

হঠাৎ হেমন্ত কেঁদে উঠল। একটা বয়স্ক লোক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এ দৃশ্য শ্মশানে নতুন নয়। অবন্তী ভাই-এর দিকে তাকাল। খুব ইচ্ছে করল ওর কাঁধে হাত রাখার। কিন্তু উত্তরটা শোনা মাত্র ওর কান্না পেল কেন? এই উত্তরের সঙ্গে মায়ের স্মৃতি এল কেন ওর?

'কাঁদিস না। তোর যা করার তা তো করেছিস।'

'আমি কিছু করিনি।'

হেমন্ত কান্না গিলছিল।

'তোর কাছেই মা ছিল। মাকে দেখা শোনা তুই-ই করেছিস।'

'যন্ত্রণা দিয়েছি, শুধু যন্ত্রণা দিয়েছি। রত্না ওকে যা তা করত, ভয়ে আমি কিছু বলিনি। একবার আড়ালে বলেছিলাম তোর কাছে চলে যেতে। মা রাজি হয়নি। আমার কাউকে রত্না সহ্য করতে পারে না।'

'ছেড়ে দে এসব কথা।'

'হ্যাঁ। সবই ছেড়ে দিতে হবে। মাকে নিয়ে বেরুবার আগে বসন্ত রত্নার কাছে টাকা চাইল। শ্মশানযাত্রীদের খুশি করতে হবে। রত্না টাকা দিল। সেই টাকায় ওরা মায়ের ডেডবডি শুইয়ে রেখে মাল খেল।'

'এতে রত্নার দোষ কোথায়? ও তো জানতো না।'

'খুশি করার মানে ও খুব ভালো জানে। দিদি, মা চলে গেল, এখন তুই ছাড়া আমার কেউ নেই-রে।' হেমন্ত তখনও কাঁদছিল।

'তোর বউ ছেলে আছে। কেউ নেই আবার কী? তাছাড়া এই যে কথাগুলো বললি তা রত্নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবি?'

'পারলে তো মাকে যন্ত্রণা দিতাম না।'

'তাহলে বলিস না।'

এই সময় একজন প্রতিবেশী কাছে এল, 'কাঁদিস না হেমন্ত, মা তো চিরকাল থাকে না। বয়সও হয়েছিল। নিজেকে সামলে নে। আর হ্যাঁ, এখানকার যা খরচ তা আমি মিটিয়ে দিয়েছি। পরে তোকে হিসেব বুঝিয়ে দেব। এখন চল।'

অবন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'কত খরচ হয়েছে?'

'ও আপনি ছেড়ে দিন, আমি পরে হেমন্তকে বলে দিব।'

অবন্তী পার্স খুলে পাঁচটা একশ টাকার নোট বের করল, 'এই নিন। যদি আরও কিছু লাগে হিসেব যখন দিবেন তখন বলবেন।'

লোকটা এক মুহূর্তে নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল।

বসন্ত কোথায় খোঁজ করতে ইচ্ছে হলো না অবন্তীর। সে যে তাকে দেখে এড়িয়ে যাচ্ছে সেটা মন্দের ভালো। এই সংকোচটুকু যা এখনও অবশিষ্ট আছে তাকে নষ্ট করে ফেলা হবে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে।

ওরা হেঁটে ফিরবে, অবন্তী রিকশা নিল।

বাড়িতে তখন রত্না একা নেই, ওর মা বোনেরা এসেছে। তারা কথা বলছিল বেশ জোরেই, অবন্তীকে দেখে ওরা চুপ করে গেল। রত্না এগিয়ে এল, 'দেখতে পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'যাক, তোমার ভাগ্য ভালো। গতকালও তোমার কথা বলছিল।'

'ও।'

'তুমি তুমি তো আর সম্পর্ক রাখোনি। আমরা না হয় পরের বাড়ির মেয়ে তাই বলে নিজের মা ভাই-এর ওপর রাগ করে দূরে থেকে কী লাভ হল।'

'তোমার কী অন্য কথা নেই?'

হেমন্তের ছেলেটা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পিসির দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। রত্না তাকে ধমকে দিল, 'অ্যাই, আয়, আয় এদিকে।'

মায়ের ঘরে ঢুকল অবন্তী। এই ঘর একসময় তারও ছিল। ঘরের মাঝখানে প্রদীপ জ্বলছে। কেমন একটা স্যাঁতসেতে গন্ধ।

ব্যাগটা নামিয়ে রাখতেই রত্না ডাকল বাইরে থেকে, 'বলো।'

'তুমি তো শ্মশান থেকে এসেছ, লোহা আগুন না ছুঁয়ে ঘরে ঢুকলে কেন? এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।'

অবন্তী বেরিয়ে এল, 'কে বলল?'

রত্নার মা বললেন, 'এটাই নিয়ম। শ্মশানযাত্রীরা সবাই একসঙ্গে লোহা আগুন ছুঁয়ে বাড়িতে ঢুকে জামা-কাপড় ধুয়ে ফেলে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। এটাই চলে আসছে। কিন্তু আমি তো শ্মশানযাত্রী ছিলাম না। মা ওখানে যাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন তারাই ওসব করবে। আমি মাকে ছুঁইনি, দূরে দাঁড়িয়ে থেকেছি। তবে আপনারা যদি অস্বস্তিতে থাকেন তা হলে সেটা দূর করতে আমি নিয়ম পালন করতে পারি।' অবন্তী বাড়ির বাইরে চলে আসতেই শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এল। বেশ ঘটা করেই তারা লোহা আগুন ছুঁয়ে ভেতরে ঢুকে মিষ্টিমুখ করতে লাগল। অবন্তী দেখল এই দলে বসন্ত নেই। রত্নার মা ডাকল,

'এসো।' অতএব স্পর্শ নিল অবন্তী। নিয়ে দেখল একটি বাচ্চার হাত ধরে বছর তিরিশের রোগা বউ অত্যন্ত সংকোচ নিয়ে এসে দাঁড়াল।

অবন্তী অনুমান করতে পারল একবার মেয়েটিকে দেখেছিল সে। সেটা বছর দশেক আগের কথা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বসন্তের বউ, না?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'এটি তোমার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি এই এলে? খবর পাওনি?'

'না। কেউ বলেনি। আপনার ভাইও না। একটু আগে একজন বলল'।

'এসো ভেতরে এসো।'

এই বাড়ি বাড়ি নয়। শ্মশানযাত্রীদের সকলের জায়গা হয়নি। মিষ্টি খেয়ে তাদের অনেকেই চলে যাচ্ছিল। সেই ভিড় ঠেলে রত্না এগিয়ে এল, 'একী! তুমি? হঠাৎ এ বাড়িতে?'

মেয়েটি বলল, 'আমাকে কেউ খবর দেয়নি।' গলার স্বর মিনমিনে।

'ওমা। সমস্ত বর্ধমান জেনে গেছে আর তুমি জানতে পারোনি? ঘুমাচ্ছিলে নাকি? এমন কথা জন্মেও শুনিনি। যার স্বামী গেছে মাকে পোড়াতে সে হাত ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। তা এখন এখানে আসা হলো কেন?'

মেয়েটি মাথা নামাল।

অবন্তী রত্নাকে দেখল। এই বাড়ির বড় বউ। প্রথম যখন এসছিল তখন বাইরের মেয়ে ছিল, এখন কতৃত্বের হাল মুঠোয় নিয়েছে।বসন্তের বউকে মা ঘরে নেয়নি। নিচু জাত বলে। বিয়ের পরই বসন্ত বউকে নিয়ে আলাদা বাসা করে আছে। যদিও সে মাঝে মাঝে এসে এ বাড়িতে হাত পাততে। এই সব খবর অবন্তী মায়ের চিঠিতে জেনেছিল।

অবন্তী বলল, 'তুমি একটু বেশি কথা বলছ। ওকে যখন কেউ জানায়নি তখন ও জানবে কি করে? আর হাজার হোক শ্বাশুড়ির মৃত্যুর খবর যখন পেয়েছে তখনই তো চলে এসেছে। আর কথা বাড়ি ও না'।

রত্না বলল, 'তুমি সেই কলকাতা থেকে আগে আসতে পারলে অথচ এই বর্ধমান থেকেও খবর পায়নি এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া মা তো ওকে বউ হিসেবে ঘরে নেয়নি। যাকগে তুমি বড়, তুমি যখন আসতে বলেছ তখন মেনে নিতে হবেই। কিন্তু এখানে পাকাপাকি থাকা চলবে না।'

অবন্তী দেখল, হেমন্ত করুন চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে।সে মায়ের ঘরে ঢুকে একপাশের তক্তাপোশে বসল। ইচ্ছে করেই আলো জ্বালালো না। প্রদীপের আলোয় যেটুকু আলোকিত হচ্ছে তাই যথেষ্ট মনে হলো। মানুষ যে দিন মারা যায় সেদিন তার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হয়। যারা জ্বালায় তারা বিশ্বাস করে মৃতের আত্মা ঘরে আসবেই। অবন্তী চোখ বন্ধ করল।

শব্দ হলো। অবন্তী দেখল বসন্তের বউ বাচ্চাটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে দরজার এ পাশে এসে বসেছে।

অবন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী করো?'

মাথা নিচু হল, 'কখনও করে কখনও করে না। আমি ঠিক জানি না।'

'ও মদ খাচ্ছে কবে থেকে?'

এবার উত্তর এল না।

'এরকম ছেলেকে প্রেম করে বিয়ে করেছিলে, কী দেখেছিলে ওর মধ্যে?'

মেয়েটির চিবুক বুকের উপর ঠেকল।

এই সময় বাইরে হাউ হাউ কান্নার শব্দ। এবং তারপরেই দরজায় এসে দাঁড়াল বসন্ত। অবন্তী কিছু বোঝার আগেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল বসন্ত তার পায়ের ওপর। 'ক্ষমা কর দিদি, আমাকে ক্ষমা করে দে। জুতো মার, লাথি মার, সেও ভি আচ্ছা, ক্ষমা করে দে।'

অবন্তী উঠে দাঁড়াল, 'আঃ। মাতলামি করছিস কেন?'

'না মাইরি! মাতলামি করছি না। আমি জানতাম তুই আসবি না। তাই বন্ধুরা ধরলে একটু

খেয়ে ফেলেছিলাম। বিশ্বাস কর, তোকে দেখা মাত্র আমার নেশা ছুটে গিয়েছে। তুই আমাকে ক্ষমা কর।'

'কেন?'

'কেন? আমি তোর সঙ্গে শত্রুতা করেছি। মায়ের কাছে তোর নামে বানিয়ে বানিয়ে লাগাতাম। তখন ছোট ছিলাম, দাদার বউ যা করতে বলত তাই করতাম। আজ মা নেই, মাথার ওপর কেউ নেই। ওহো!'

'মায়ের খবরটা বউকে দিসনি কেন?'

বসন্ত হঠাৎ চুপ করে গেল।

অবন্তী কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'সত্যি বলছি। ঘরে একটাও পয়সা নেই। ও আজ সেলাই ডেলিভারী না দিলে খাওয়া জুটবে না। তাই-।'

সঙ্গে সঙ্গে অবন্তী মেয়েটির দিকে তাকাল, 'ও কি ঠিক বলছে? সত্যি বল!'

মেয়েটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বসন্ত তখন তার বউ মেয়েকে দেখতে পেয়েছে, 'অ। তোমরা এসে গেছ। এসে ভালোই করেছ। একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছ। এই হলো আমাদের দিদি। বাবা যখন মারা গেল, তখন অবশ্যি আমি খুব ছোট্ট ছিলাম, তখন থেকে দিদি এই সংসারের হাল ধরে আছে । নিজের জন্য ভাবেনি, বিয়ে করেনি বুঝলে? সিনেমাতেও দেখতে যায় না। সেই যে বিয়ের আগে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে, দিদিকে দেখিয়েছিলাম, এই সেই দিদি। ব্যস আমার সব চিন্তার শেষ হয়ে গেল।'

অবন্তী বলল, তুই এবার যা। আমাকে একলা থাকতে দে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কিন্তু দিদি এখন তো আমাদের অশৌচ। এই সময় কী সব করতে হয়। বাড়িতে থাকলে ওসব করতে পারবো না। জানিই না তো করব। শ্মশানে বলল, 'দু ভাইকে একসঙ্গে হবিষ্যি খেতে হবে নইলে মায়ের আত্মা শান্তি পাবে না। তাই হোক।'

রত্নার গলা পাওয়া গেল, 'একসঙ্গে খেতে হবে তার কোন মানে নেই।'

হেমন্তের গলা শোনা গেল, 'অশৌচের সময় আর ঝামেলা করো না।'

রত্না গজগজ করল, 'ঝামেলা করতেই তো দ্যাখো তুমি। এই হবিষ্যি খাওয়ার নাম করে এখানে ঢুকে যদি আর বেরুতে না চায় তা হলে কী করবে? যিনি আজ স্বর্গে গেছেন তিনি শান্তি পাবেন? এ বাড়িতে বউকে নিয়ে ঢুকতে দেননি তিনি তোমার গুণধর ভাইকে।

অবন্তী বেরিয়ে এল দরজায়, 'রত্না যাকে শান্তি দিতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তিনি আমার ব্যাপারে তোমাকে কী বলে গেছেন?'

'একি দিদি, এভাবে কথা বলছেন কেন? ইদানীং মা সবসময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুঃখ করতেন।'

'ও! এই ঘরটায় আমি থাকলে তোমার তা হলে আপত্তি নেই ?'

'ছি ছি ছি ! এতো আপনাদের বাড়ি । আমি পরের বাড়ির মেয়ে।'

'তা হলে কাজ না হওয়া পর্যন্ত বসন্তের মেয়ে বউ এঘরে থাকবে। আর প্রতি রাতে খেয়ে দেয়ে বসন্ত তার বাসায় ফিরে যাবে।'

বসন্ত মিন মিন করল, 'প্রায় আধ মাইল রাস্তারে দিদি। আমার বেশি জায়গা লাগবে না। এই এক কোণে ঠিক লেটে যেতে পারব।'

'না। এখন বাড়ি গিয়ে ওদের জামা কাপড় নিয়ে আয়। তোর দোষে মা এই মেয়েটাকে শাস্তি দিয়েছিল, আমি এই ভুলটা এখন করতে চাই না।'

এ বাড়িতে একটা ছাদ আছে। চিলতে ছাদ। ছেলেবেলায় ওই ছাদে উঠলে মা নিচ থেকে চেঁচাতো ন্যাড়া ছাদ থেকে পড়ে গেলে সারা জীবন ঠুঁটো হয়ে থাতকে হবে। কথাটা তখন বোঝেনি। আজ ছাদে উঠে কথাটা মনে পড়ল। ন্যাড়া ছাদ থেকে কেউ কেউ পা পিছলে পড়ে যায় আবার কাউকে ঠেলে ফেলা দেওয়া হয়। ওই যে নিচে তার ঘরে মেয়েকে কোলে নিয়ে যে মেয়েটা চোরের মতো বসে আছে সে পড়েছে পা পিছলে। আর তাকে ঠেলে দিয়েছে ভাগ্য। ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়! কিন্তু পরিণতি তো একই। সেই ঠুঁটো হয়ে বেঁচে থাকা।

অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়ে অবন্তী দেখল চারপাশের বাড়িগুলো বেশ উঁচুউঁচু। জানালাগুলোতে আলো জ্বলছে। ছেলেবেলায় ওগুলো জ্বলছিল না। খুব গরম পড়লে ওরা সবাই ছাদে এসে শুত। ভোরবেলায় মা তোকে ডেকে নিচে চলে যেত। বলত দিনের আলোয় মেয়েমানুষকে খোলা আকাশের নিচে ঘুমাতে নেই। যদিও তখন কারও পক্ষে তাদের ঘুমন্ত শরীর দেখার উপায় ছিল না। এখন যে কোনো জানালায় কেউ এসে দাঁড়ালে না দেখে থাকতে পারবে না ।

স্নান করে কাপড় পাল্টে এসেছে অবন্তী। রত্না মুড়ি দিতে চেয়েছিল, বাটিটা বসন্তের মেয়েকে দিতে বলে এসেছে সে। ছাদে বসল অবন্তী। মাথার ওপর নীল আকাশ। অজস্র তারা। বাবার পাশে শুয়ে তারা চিনত। কোনটা সপ্তর্ষি, কোনটা কালপুরুষ! সব। অনেক অনেক তারা চিনে ফেলেছিল তখন। আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, কতদিন আকাশ দেখা হয়নি। অথচ তারাগুলো সেইরকম রয়ে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে একটা অচেনা তারাকে বেশ জ্বলজ্বল করতে দেখল সে। ওটা কোন তারা? বাবা থাকলে ঠিক বলে দিত।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাকে যেন দেখতে পেল অবন্তী। কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। বর্ধমান হাই স্কুলের ইংরেজির মাস্টারমশাই। নেসফিল্ডের গ্রামার যাঁর মুখস্থ ছিল। সেক্সপীয়ার আবৃত্তি করা যার শখ ছিল। রবীন্দ্রনাথ যার কাছের মানুষ ছিলেন। আর এ সব তিনি দু হাত ভরে দিতে চেয়েছিলেন মেয়েকে।

কমলাকান্ত প্রাইভেট টিউশনি করতে চাইতেন না। বলতেন, 'আমার স্কুলের কোনও ছাত্রকে আমি পড়াব না আলাদা করে। তা হলে অন্যদের সঙ্গে প্রতারনা করা হবে। যদি অন্য স্কুলের ভালো ছেলে আসে তা হলে ভেবে দেখতে পারি।'

তখন বাবার সহকর্মীরা টিউশনি থেকে প্রচুর টাকা রোজগার করত। সেটা বোঝা যেত তাঁদের বাড়িতে গেলে। একটু একটু করে দোতলা তিন তলা বাড়ি হয়ে যেত তাঁদের। বাবার এ সবে মন ছিল না। স্কুলের চাকরিতে যা মাইনে পেতেন তা ভালোমন্দ খাওয়াতেই শেষ হয়ে যেত। মাঝেমধ্যে বই কিনত। নুতন ছাত্র তার কাছে পড়তে চাইলে তিনি বলতেন , 'অবু, এই ছেলেটি ক্লাস এইটে পড়ে। আমার স্কুলে নয় তাই ওকে পড়াতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাকে তাকে তো আর পড়াতে পারব না। তুই ওকে টেস্ট করে বল কেমন ছাত্র!'

অবন্তীকে ওদের পরীক্ষা নিতে হতো। সে সব পরীক্ষা ছিল বেশ মজার। তিনটি সরল বাক্যে আকাশের বর্ণনা কর। অবশ্যই ইংরেজিতে। এবং সেই তিনটি ইংরেজি বাক্যের বাংলা অনুবাদ করো। তারপর সেই কঠিন প্রশ্ন, কবিতা কাকে বলে? এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্ক হতো। কবিতা কাকে বলে জানতে চাইলে কেউ কেউ চার ঘণ্টার বক্তৃতা দিতে পারেন। অবন্তীর কলেজের অধ্যাপক পরপর চার দিন ওই বিষয়ে কথা বলেও শেষ করতে পারেননি। তাই ক্লাস এইটের ছাত্রকে ওই বিষয়ে কেন প্রশ্ন করা হবে?

বাবা হাসতেন, 'প্রত্যেক বয়সে তার মতো করে জানে। আট বছরের বাচ্চার কাছে বৃষ্টি সম্পর্কে জানতে চাইলে সে তার মতো করে বলবে। তোরা যারা কলেজে পড়িস তারা চার পাতার রচনা লিখবি। ক্লাস এইটের ছাত্র কবিতা সম্পর্কে যেটুকু বোঝে তাই লিখুক না।'

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবন্তীর কাছে ছেলেরা ফেল করে যাওয়ায় বাবার কাছে তাদের পড়া হয়ে উঠত না। তাই নতুন কেউ এলেই মা তাকে ইশারা করে ভেতরে ডেকে নিয়ে যেতেন, 'শোনো, তোমাকে পাকামো করতে হবে না। এই ছেলে যেমনই লিখুক তুমি ওকে পাশ করিয়ে দেবে।'

'সে কী ? সেটা তো অন্যায়!' অবন্তী আঁতকে উঠেছিল।

'অন্যায় আবার কী! ও যদি সব জানত তা হলে কি টাকা দিয়ে তোর বাবার কাছে শিখতে আসত? এখন যদি কম জানে তা হলে পড়তে পড়তে শিখে যাবে। টিউশনির টাকা না এলে সংসার চালাতে পারব না আমি।'

শেষ পর্যন্ত মাসে তিনশ টাকা বাড়তি রোজগার হওয়ায় মায়ের মুখে হাসি ফুটেছিল। ওই টাকা মানে পূজোর আগে কেনাকাটা সম্পর্কে নিশ্চিন্তি। তখন চাহিদা কম ছিল।

হেমন্তের বয়স তখন বারো, বসন্তের আট। অবন্তী তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় আকাশের দিকে নজর যেতেই দেখল একটা বিরাট সাদা মেঘ স্থির হয়ে রয়েছে। সাদা মেঘ স্থির হয়ে থাক অথবা উড়ে যাক তাকে নিয়ে মাথা ঘামানো কোন

মানে হয় না। কারণ যা নিত্য ঘটে তার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নেই। আজই ক্লাসে অধ্যাপক বলেছেন প্রাত্যহিকের সাধারণ ঘটনা সামান্য রূপ বদলালে কখনও কখনও অসামান্য হয়ে উঠে। যিনি শিল্পী তিনি ওই রূপটাকে মর্যাদা দেন। এই সাদা মেঘগুলোকে সে প্রায়াই দেখে। বর্ষাকালে যখন বিশাল কালো মেঘের দল উড়ে বেড়ায় সেটাও স্বাভাবিক বলে কোনও আলাদা স্বীকৃতি পায়না। কিন্তু আজকের এই সাদা মেঘের প্রান্তে কেউ যেন পলিমাটি মাখিয়ে দিয়েছে। মেঘের গায়ে মাটির গন্ধ। রোমাঞ্চিত হলো অবন্তী। বাঃ! সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে মেঘটার অন্য রূপ ধরা পড়ল। ওই অত দূরের আকাশে স্থির হয়ে থাকা মেঘটার গায়ে সোঁদা গন্ধ সে টের পাচ্ছিল। উচ্ছসিত অবন্তী দ্রুত বাড়িতে এল বাবাকে খবরটা শোনাবে বলে। এসে দেখল বাবা এক যুবকের সঙ্গে তন্ময় হয়ে মিল্টন নিয়ে আলোচনায় মশগুল।

জানালা দিয়ে বাবা তাকে দেখতে পেল। এ বাড়ির দরজা দিয়ে উঠানে পা দিলে বাঁ দিকের ছোট ঘরটায় বাবা বসতেন। উঠোনের ডানদিকে তাদের শোবার ঘর। এই ব্যবস্থা এখনও রয়েছে। সে চুপচাপ উঠানে পা দিতেই বাবার গলা কানে এল।

'অবু মা এখানে এসো।'

যুবক মুখ তুলে তাকাল। এমন শান্ত চাহনি কোনও দিন দেখেনি অবন্তী। ঈশ্বর কোনও কোনও মানুষকে তৈরি করার সময় শয়তানের সামান্য ছোঁয়াও তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন না।

'এই হলো অবন্তী আমার বড় মেয়ে। ইংরেজি নিয়ে কলেজে পড়ছে। আর এ হলো স্বর্ণেন্দু। স্বর্ণেন্দ—?

'সেনগুপ্ত।'

'হ্যাঁ। ও আমার স্কুলে ফিলজফি পড়াতে এসেছে। ফ্রেশ এম এ বি এড। ওর কাছে হালফিলের খবর নিচ্ছিলাম। ফিলজফির ছাত্র বলে ভাবিস না ও সাহিত্যের খোঁজ খবর রাখে না। ও আমার সঙ্গে একমত শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথের শৌখিন মজদুরি।'

অবন্তী গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।'

বাবা বললেন 'বাঃ। এতে মনে হচ্ছে আড্ডা জমবে ভালো। আয় বস। হ্যাঁ, তোমার বক্তব্য কী শুনি?'

'শৌখিন মজদুরি বলতে তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আমি কেন বলব? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যাখ্যা করে গেছেন। এবং এটা ওর শেষের কবিতা সম্পর্কে প্রযোজ্য।'

স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'শেষের কবিতা কি আপনার বানানো উপন্যাস বলে মনে হয় না? চরিত্রগুলো রক্ত মাংসের নয়, সাজানো কথা বলে। যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের চরিত্রগুলো আমাদের স্পর্শ করে অমিত বা লাবণ্য সে ভাবে করে না। রবীন্দ্রনাথ একটা আধুনিক প্রেমের উপন্যাস লিখতে গিয়েছিলেন কিন্তু এই সব চরিত্র আকাশচারী ছিল, তাই না?'

অবন্তী বলেছিল, 'তা হলে তো রক্তকরবীকেও আপনি সাজানো নাটক বলবেন।'

'না। রক্তকরবী রূপক। তার ব্যাখ্যা আলাদা।।'

'তা কেন হবে। রক্তকরবীর সংলাপ তো অতি রঞ্জিত, বানানো। ওভাবে কোনো মানুষ কথা বলে না। তাই না?'

'আগেই বললাম সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ রূপক নাটক লিখেছিলেন। রক্তকরবীর বক্তব্যটাও ওই আলোতে পরিবেশন করা হয়েছে বলে সত্যিকারের শিল্প হয়ে উঠেছে।'

'এই একই কথা শেষের কবিতা সর্ম্পকে ভাবতে পারছেন না কেন?'

'তার মানে?' স্বর্ণেন্দু হকচকিয়ে গেল।'

'মনে করুন শেষের কবিতা রূপক উপন্যাস। বিয়ের আগে নরনারীর মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয় তা বেঁচে থাকে বিচ্ছেদে। বন্ধুত্বের সময় যে কথা বলা তা শুধু বলার জন্যে বলা অথবা বলার আনন্দেই বলা। বাস্তব জীবনে যখন তার দাম থাকবে না তখন বন্ধুকে বিদায় জানাতেই হয়। তাই না?'

স্বর্ণেন্দু তাকিয়েছিল। বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। এরপর আর তর্ক চলতে পারেনা। কিন্তু মা অমিত রায়ের কথাগুলো যদি একটু কম সাজানো হতো তা হলে মন্দ হতো-না।'

অবন্তী হাসল, 'জানো বাবা, আজ কলেজ থেকে ফেরার সময় আকাশে একটা বিশাল সাদা

মেঘ ছিল। আর সেই মেঘের কোণে এমন একটা মেঠো রং মিশেছিল যে মনে হচ্ছিল মাটি লেগে গেছে। আর তাই দেখে আমি মেঘটার গায়ে সোঁদা গন্ধ টের পেলাম। এইযে আমার অনুভূতিটা এটা কি সাজানো? আমার কাছে কি সত্যি নয়?'

স্বর্ণেন্দু, 'রবীন্দ্রনাথ এর জবাব দিয়েছেন। হীরে বসানো সোনার ফুল, নিশ্চয়ই পড়া আছে।'

সেদিন সন্ধেবেলায় ঝড় এবং বৃষ্টি হয়েছিল। স্বর্ণেন্দু চলে গিয়েছিল তার আগে। অবন্তীর মনে হয়েছিল এতক্ষণে মেঘের গায়ে লেগে থাকা মাটি পৃথিবীতে তার জায়গায় ফিরে এল।

দিন তিনেক বাদে আবার স্বর্ণেন্দুর সাথে দেখা। ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখানো হচ্ছিল সিনে ক্লাবের ব্যবস্থাপনায়। 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখতে গিয়েছিল অবন্তী। হলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল স্বর্ণেন্দু। দেখা মাত্র এগিয়ে এসে বলল, 'কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'সেদিন আপনার কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে।'

অবন্তী লজ্জা পেয়েছিল। তর্ক করার সময় কথা বলতে নেশা পেয়ে যায়, তখন অনেক কিছু বলা যায়।

'এর আগে 'মেঘে ঢাকা তারা' দ্যাখেননি?'

'না।'

'আমি কলেজে পড়ার সময় দেখেছিলাম। ভাবছিলাম দুবার দেখব কিনা।'

'কেন?'

'কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। বারো বছর বয়সে দস্যু মোহন পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার স্মৃতি বেশ জ্বলজ্বলে ছিল। কলেজে পড়ার সময় সেই বইটি আবার পড়তে গিয়ে শেষ করতে পারিনি। এমন ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল যে কী করে প্রথমবার মুগ্ধ হয়েছিলাম ভেবে পাইনি। এই রকম অনেকবার হয়েছে। তা ছাড়া প্রথমবার যে চমক থাকে তা সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি আড়াল করে রাখে। দ্বিতীয়বারে তা ধরা পড়ে বলে ভালোলাগাটা নষ্ট হয়ে যায়।' স্বর্ণেন্দু বলেছিল।

অবন্তী বলেছিল, 'সেইজন্যেই বলা হয় পণ্ডিতরা রস উপভোগ করতে পারেন না। খুঁটিয়ে বিচার করতে করতেই তাদের সময় চলে যায়।' স্বর্ণেন্দু হো হো হেসেছিল, 'আমি কিন্তু পণ্ডিত নই।'

এই সময় অবন্তীর বান্ধবী পৌঁছে গিয়েছিল। বিদায় নিয়ে দুজন পাশাপাশি বসে তন্ময় হয়ে ছবি দেখছিল। ইন্টারভ্যালে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করেছিল, কে রে? খুব হ্যান্ডসাম দেখতে।'

অবন্তী ঠাট্টা করেছিল, 'পছন্দ হয়েছে?'

'খু-উ-ব।' বান্ধবী মাথা নেড়ে হাসতে চেয়েছিল, 'বল না, কে?'

'স্কুলে পড়ায়।'

'স্কুলে? যাচ্ছলে।'

'কেন?'

'দূর, মাস্টারের সঙ্গে বাবা কিছুতেই বিয়ে দেবে না।'

'তুই একেবারে বিয়ের কথা ভেবে ফেললি?'

'না কেন? আমি যার সঙ্গে প্রেম করব তার সঙ্গেই বিয়ে হবে।'

'বাঃ। মেয়েদের তো বিয়ে হয়, ছেলেরা বিয়ে করে।'

'চমৎকার!' অবন্তী বলল, 'আচ্ছা, স্বর্ণেন্দুবাবু যদি অন্য চাকরি করে?'

'কী চাকরি?'

'তা জানি না।'

'মেঘে ঢাকা তারা'র নায়িকার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল দুজনেরই। বান্ধবী বলল, 'দূর, মন খারাপ হয়ে যায় এরকম সিনেমা দেখলে। কেউ আজকাল এভাবে আত্মত্যাগ করে না।'

সিনেমা শেষ হয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল স্বর্ণেন্দু একজনের সঙ্গে কথা বলছে, অবন্তী বান্ধবীকে বলল, 'চল তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

ওরা কাছে আসতে ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্ণেন্দু বলল, 'বলুন কী রকম লাগল?'

অবন্তী হাসল, 'তার আগে বলুন, স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে নাকি?'

'না। হয়নি।' স্বর্ণেন্দু হাসল।

'আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু আমার বান্ধবীর মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওর নাম স্বাতী দত্ত।'

'নমস্কার। আমি স্বর্ণেন্দু। মন খারাপ হয়েছে মানে আপনি নায়িকাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন, তাই তো?'

'হয়তো, কিন্তু আমি হলে ওসব করতাম না। এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবার কোনও মানে নেই।'

'ও'।

'আপনি স্কুলে পড়ান?'

'হ্যাঁ।'

'যেমন?'

'এই ধরুন, ডব্লু বি সি এস অথবা আই এ এস?'

'নাঃ। পড়াতেই আমার ভালো লাগে।'

'ও। এই অবন্তী, আমি যাইরে, কাল দেখা হবে।'

একটা রিকশা নিয়ে স্বাতী চলে যেতে স্বর্ণেন্দু বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো, আপনার বান্ধবীকে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

'ও মাস্টারমশাইদের পছন্দ করে না!' অবন্তী বলল।

'তার মানে?' স্বর্ণেন্দু অবাক।

'মাস্টারমশাইদের ও খুব ভয় পায়।' হেসেছিল অবন্তী, 'আপনি যদি ওর ভয় ভাঙাতে চান তা হলে আপনাকে হয় আই এ এস নয় ডব্লু বি সি এস পাশ করতে হবে।'

'সরি! আমি যা তাই থাকতে চাই।'

'দিদি!' নিচু গলার ডাকটা কানে আসতেই ঘুরে অবন্তী। এই বাড়ির ছাদে আগের মতো অন্ধকার না জমলেও মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রত্নাকে চেনা গেল। কাছে এসে দাঁড়াল রত্না, 'আমি জানি তুমি আমাকে খুব খারাপ ভাবছ, তাই না?'

এখন ওর গলার স্বরে কোমল স্পর্শ।

'কিছু বলবে?'

'আমি যে কী করব ভেবে পাই-না দিদি!'

'কেন?'

'তোমার ভাই-এর অবস্থা তো জানো। মুদির দোকান থেকে যা আয় হয় তাতে টেনেটুনে চলত। তুমি মাকে টাকা পাঠাতে বলে অভাবটা ধরা পড়ত না। থাকার মধ্যে তো এই ছোট বাড়িটা। দু-দুটো বাচ্চা বড় হচ্ছে। ওদের ঠাকুর্দা মাস্টার ছিল অথচ ওরা পয়সার অভাবে টিউটোরিয়ালে যেতে পারে না। তবু আমি কোনও মতে চালাচ্ছি। এর মধ্যে যদি বসন্তর মেয়েবউ এসে জোটে তা হলে তো শেষ হয়ে যাব।'

'কেন?'

'এইটুকু জায়গায় আলাদা রান্না করা সম্ভব না। আর চোখের সামনে ওরা না খেয়ে আছে তা দেখতে পারব না।'

'কিন্তু বসন্তর মেয়েটা তো কোনও দোষ করেনি।'

'মানছি। কিন্তু মা তো ওদের ঘরে নেননি।'

'কাজটা কি মা ঠিক করেছিলেন?'

'তখন তো তুমিও মায়ের কথা মেনে নিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ। মেনে নিয়েছি। কারণ যেখানে আমি থাকব না সেখানে আমার সিদ্ধান্তের জন্যে কোনও অশান্তি হোক আমি চাইনি।'

'দিদি, তুমি আমার কথা ভাব। এতদিন ধরে তো এই সংসারটাকে আমিই টানলাম। মা আমার সঙ্গে কম খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু আমিই তো তাঁর সেবা করেছি। আমার কি

কোনও দাবি থাকতে পারে না?'

অবন্তী অনেকক্ষণ থেকেই রত্নার এই পরিবর্তিত রূপ দেখে অবাক হচ্ছিল।

সেই ঝাঁঝ, ঠেস দিয়ে কথা বলার ঢংটা উধাও। নিজের ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত মায়ের ভূমিকায় এখন সে।

অবন্তী বলল, 'রত্না, ধরো তোমার সঙ্গে প্রেম করে হেমন্ত যখন বিয়ে করতে চাইল তখন মা বা আমি যদি রাজি না হতাম তা হলে কী করতে? সত্যি কথা তুমিও জানো, আমি রাজি হইনি। যে ছেলের রোজগার তখন নামমাত্র সে কোন সাহসে বিয়ে করবে? তখন মা জোর করলেন। কারণ তোমরা ব্রাহ্মণ এবং মায়ের পক্ষে আর সংসারে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু মা যদি রাজি না হতেন? তোমাকে যদি এ বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া হত? হেমন্ত যদি তোমাকে বস্তিতে ঘর ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে তুলত? তা হলে বসন্তর বউ-এর যে দশা হয়েছে তোমারও তাই হত। তাই না?'

'তুমি এসব কী বলছ দিদি?'

'সত্য খুব নির্মম রত্না। ওই মেয়েটির ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা তোমার ক্ষেত্রেও হতে পারত। অথচ নিজে মেয়ে হয়েও কষ্টটা বুঝতে পারছ না। অবশ্য মেয়েরা কোনও দিনই বুঝতে চায় না'।

'বেশ, ও থাকুক শ্রাদ্ধ পর্যন্ত। কিন্তু তারপর—।'

'তারপর আমিও চলে যাব, ওরাও থাকবে না।'

'তোমাকে চলে যেতে বলার স্পর্ধা যেন আমর কখনও না হয়।'

'তা হলে আমার কথা শোনো, মায়ের কাজ সবাই মিলেমিশে করো।'

রত্না আর কথা বাড়াল না। সে নেমে যেতে অবন্তীর খেয়াল হল অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি। আজকাল বেশিক্ষণ না খেলে পেটে ব্যথা হয়। একদিন না পেরে ডাক্তার দেখিয়েছিল সে। সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'একদম খালি রাখবেন না পেট। যত অল্পই হোক চার ঘণ্টা অন্তর খেয়ে নেবেন।' সেই সকাল নটায় অফিস যাওয়ার আগে খেয়েছিল সে। বারো ঘণ্টা চলে গেছে। খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। থাকলেও সুযোগ পেত না। এখন এই বাড়িতে কী খেতে পারে সে? প্রথম কথা, রত্নাকে বলতে হবে। বাচ্চারা কিছু খেয়েছে কি না জানা নেই। বসন্তর মেয়ে বউ যে খায়নি সেটা জানা আছে। খাবার আছে কি না তাও বোঝা মুশকিল। তা ছাড়া এখন এ বাড়িতে অশৌচ চলছে। শ্মশানযাত্রীদের জন্যে মিষ্টি আনা হয়েছিল এটা সে দেখেছে। কিন্তু কিছু না খেলে উপায় নেই। চিনচিনে ব্যথাটা এবার জানান দিচ্ছে।

চাঁদ থেকে নেমে আসতেই হেমন্তকে দেখতে পেল অবন্তী। বলল, 'টাকা দিচ্ছি, একটু মিষ্টি নিয়ে আয় তো।'

'কেন? কে খাবে?

'আমি।' অবন্তী মরিয়া হয়ে জবাব দিল।

'তোমার কি এখন মিষ্টি খাওয়া উচিত হবে?'

'কেন?'

'এখন তো আমাদের নিজেদের ফোটানো খাবার খাওয়া উচিত। হলুদ মশলা ছাড়া। তোমার তো গোত্রান্তর হয়নি। তোমারও তো করা উচিত।'

'আমি জানি না। মুশকিল হল, আমার পেটে একটা ঘা আছে। বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। শাস্ত্রে যদি অবিবাহিতা মেয়েকে হবিষ্যি করতে বলে থাকে তা হলেও আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

রত্না এগিয়ে এল, 'পেঁয়াজ রসুন মাছ না খেলেই হল। অতমত নিয়ম আজকাল কে আর মানছে। যার অসুখ তাকে নিয়ম মানতে হবে না। এসো দিদি, ঘরে মিষ্টি আছে, আনতে হবে না।'

রত্নাকে অবাক হয়ে দেখল অবন্তী। এত দ্রুত ও পাল্টে গিয়েছে যে অবন্তী তাল রাখতে পারছিল না।

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্লেটে মিষ্টি দিল রত্না, 'আমারই উচিত ছিল শ্মশান থেকে ঘুরে আসার পর তোমাকে খেতে দেওয়া। মাথার ঠিক থাকে না আজকাল। খাও।'

ঘরে হেমন্তর ছেলেদুটো ছিল। তাদের দেখিয়ে অবন্তী জিজ্ঞেস করল, 'ওদের জলখাবার দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। না দিলে ছাড়বে আমাকে।'
'তোমার কি মিষ্টি বাড়তি আছে?'
'কেন?'
'বসন্তের মেয়েটাকে দিয়ে এসো। বেচারার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে ওর।'
রত্না একটা প্লেটে দুটো সন্দেশ রেখে বড় ছেলেকে ডাকল, 'এ্যাই। পাশের ঘরে যে ছোট বোনটা আছে তাকে দিয়ে আয়।'
'আমাদের দেবে না?'
'না। সন্ধেবেলায় মুড়ি খেয়েছ, আর খেতে হবে না।'
কথাটা শোনামাত্র ছোটটা কান্না শুরু কর। বড়টা প্লেট নিয়ে বেরিয়ে গেল।
অবন্তী তার প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে ছোটর হাতে দিতে কান্না থামল। মুখে সন্দেশ দিতেই এক টকটকা স্বাদ পেল অবন্তী। পুরনো সন্দেশ? শ্মশানযাত্রীদের জন্যে শস্তায় কেনা হয়েছে নাকি। আর বিচার করার অবকাশ নেই, অবন্তী রত্নার বাড়িয়ে দেওয়া গ্লাসের জল গলায় ঢেলে দিল।
রাতের খাওয়া-ঝামেলা ছিল না। দুই ভাইকে হবিষ্যি করতে সাহায্য করল রত্না। বসন্তের বউ খিচুড়ি রাঁধল সবার জন্যে। খেয়ে দেয়ে মেয়েটা অবন্তীর কাছে এল, 'দিদি, আমরা যাই।'
'যাই মানে?'
'আবার কাল সকালে আসব।'
'কেন? আমি যে বললাম তুমি মেয়েকে নিয়ে এখানেই থাকবে।'
মেয়েটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।
'তোমার নামটা কী-যেন?'
'কাবেরী।'
'ও। তা আমার কথা ভালো লাগছে না?'
'আপনি রাগ করবেন না।'
'না, রাগ করার অধিকারও তো এ বাড়িতে আমার নেই।'
'ওকে একা থাকতে বলবেন না দিদি।'
'কেন?'
'আমরা নেই জানলেই ওর বন্ধুরা জুটে যাবে। ঘরে হইহল্লা হবে। ওইসব খাবে। এই ভয়ে আমি চলে যেতে চাইছি।'
'কিন্তু অনেকদূর পথ, বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়াআসা করতে তো তোমার কষ্ট হবে কাবেরী।' অবন্তীর মন বদলাল।
'হবে। কিন্তু আশেপাশের ঘরের মেয়েদের কাছ থেকে কথা শুনতে হবে না। সেটা বেশি কষ্টের।'
'তুমি বসন্তকে নিষেধ করো না?'
'আমার মুখ বাধা হয়ে গেছে।'
'আশ্চর্য।'
'ও একা থাকলে এক রকম আর বন্ধুদের সঙ্গ পেলে অন্য রকম।'
'তোমার মা-বাবার কাছে যাও না?'
কাবেরী মাথা নিচু করে রইল।
'সম্পর্ক নেই বুঝি?'
'না।'
প্রশ্ন না করে পারল না অবন্তী, 'জীবনটা এমন হবে জেনেও ওকে তুমি বিয়ে করলে কেন? কী দেখেছিলে ওর মধ্যে?'
উত্তর না পেয়ে অবন্তী কাবেরীর দিকে তাকাতে দেখল মেয়েটার দু গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। শিশিরকে যারা মুক্তো ভেবে নেয় ভরদুপুরের খরায় তাদের কোনও জবাব থাকে না।

ঘুমন্ত মেয়েকে তুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল কাবেরী, রত্না ডাকল, 'কোথায় যাচ্ছ?'
'বাসায়।'
'বাঃ। বাড়ির বউ এত রাত্রে বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, পাড়ায় আমাদের সম্মান থাকবে? দিদি তো বলেই দিয়েছে থাকতে।'
'আমি কাল আসব।'
'ওই পুঁচকে মেয়েটাকে নিয়ে আসাযাওয়া করবে? বাঃ। ঠিক আছে, এ বাড়িতে তুমি থাকতে না চাও ওটাকে রেখে যাও। ঘুমন্ত বাচ্চাকে নিয়ে যেতে হবে না।'
'ও যদি ঘুম থেকে উঠে আমাকে না দ্যাখে তা হলে—।'
'আমি বাচ্চা মানুষ করিনি? যা হবে আমি সামলে নেব। দিদির ঘরে বিছানা করে দিয়েছিলাম, ওখানেই শুইয়ে দাও।'
হেমন্ত খানিকটা দূরে দাড়িয়ে অবাক হয়ে স্ত্রীর কথা শুনছিল। রত্নাকে এই ভূমিকায় দেখবে সে কল্পনাও করেনি। তার পাশে দাঁড়ানো বসন্ত বলল, 'তুমি কেন খামোকা যাচ্ছ। মেয়ের সঙ্গে থেকে যাও।'
'কাবেরী এখানে থাকলে বাড়ি গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মচ্ছব করতে সুবিধে হবে, তাই তো?' অবন্তী জিজ্ঞাসা করল।
'কী কথা বলছ?' বসন্ত আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল।
'কী বলতে চাইছি তা তোর অজনা নয়। বসন্ত, আজ মা মারা গিয়েছে। যতদিন অশৌচ চলবে, ওই পোশাকটা পরে থাকবি তদ্দিন নেশা করবি না। এই সামান্য অনুরোধ রাখতে পারবি?' অবন্তী তাকাল।
অন্যদিকে তাকাল বসন্ত। তারপর বলল, 'না খেলে কষ্ট হয়।'
'কষ্ট হয়? এই বয়সে? নিজেকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিস তুই? বেশ, খেতে হলে এই বাড়িতে আমার সামনে বসে খাবি।'
'দিদি!' হতভম্ব হয়ে গেল বসন্ত। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, কথা দিলাম এই সময় খাব না।' বসন্ত আর দাঁড়াল না। কাবেরী কী করবে বুঝতে পারছিল না, অবন্তী বলল, 'যাও, মেয়েটাকে শুইয়ে দাও। তুমি তো আসা অবধি একই কাপড়ে রয়েছ, বসন্ত কিছু নিয়ে আসেনি?'
'এনেছে।' নিচু গলায় জবাব দিয়ে কাবেরী মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

নিজের কাছে ধরা পড়ে গেল অবন্তী। জ্ঞান হওয়ার পর শরীরটার এত বড় হয়ে ওঠার সময়টা যা কখনও হয়নি এখন তাই হচ্ছে। স্বর্ণেন্দুকে দেখলেই কী রকম আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজকাল। কথা বলা সময় জিভ ভারী নিঃশ্বাস দ্রুত, অথচ সব ছাপিয়ে এক অপূর্ব আনন্দ নিয়ে বসে থাকা।
স্বর্ণেন্দু তার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড়। ওদের বাড়ি গুসকরায়। বাবা নেই, মা আছেন। ভাই-বোন না থাকায় মা বর্ধমানে ছেলের বাড়িতে থাকেন বেশির ভাগ সময়। তৃতীয় দিন বাইরে দেখা হতেই স্বর্ণেন্দু বলল, 'আজ আমাদের বাড়িতে চলো। তোমাকে মায়ের সামনে হাজির করব।'
অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অবন্তী।
স্বর্ণেন্দু বলেছিল, 'বর্ধমান শহরটা তো কলকাতায় নয়? এখানে মানুষ সব ব্যাপারেই কৌতূহলী। তোমার সঙ্গে আলাপ হলে মা আর উড়ো খবরে বিশ্বাস করবেন না।
দেখছ না, সবাই কী আগ্রহ নিয়ে আমাদের দেখছে!'
এসব লক্ষ করার মতো মন ছিল না অবন্তীর। বলল, 'দেখুক গে। আমরা কি চুরিমারি করছি যে ভয়ে থাকব?'
'তোমার দেখছি খুব সাহস?'
'যতক্ষণ আমি অন্যায় না করছি ততক্ষণ আমি ভিতু নই।'
'তা হলে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা ন্যায় না অন্যায়, কার মধ্যে পড়ে?'
'কোনওটাই নয়। ওটাকে বলে সৌজন্য। মাস্টামশাইকে কথা জুগিয়ে দিতে হচ্ছে কেন? নাকি আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে?'
স্বর্ণেন্দু হেসে ফেলেছিল। তারপর মাথা নেড়ে বলেছিল, 'চলো।'

'খুব সাহসী হয়ে গেছ দেখছ।'

'সাহসের কথা উঠছে কেন? বাবা আমার ভালো বন্ধু।'

'বেশ। মা চাইছেন অঘ্রাণেই ব্যবস্থা করতে।'

অঘ্রান! বাড়িতে ফিরে সোজা ছাদে চলে গিয়েছিল অবন্তী। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই, তখণ ছাদে দাঁড়ালেই আকাশটা নিচে নেমে আসত। তখন শেষ-বিকেল। সূর্য নেই কিন্তু অন্ধকারও নামেনি। উঠোনে দাঁড়িয়ে মা চিৎকার করল, 'ও অবু। এই সময় ন্যাড়া ছাদে উঠলি? পা পিছলে পড়লে তোকে চিরকাল ঠুটো হয়ে থাকতে হবে।'

অবন্তী আলসের গায়ে এসে দাড়াল, 'ইস, পায়ে যাদের জোর নেই তাদেরই পিছলে যায়। বাবা, বাবা! এখানে একটু এসো।' চেঁচিয়েছিল সে।

কমলাকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, 'কী হল রে?'

'এখানে এসো না, প্লিজ?'

মা গজগজ করছিল, বাবা ছাদে এলেন, 'বিউটিফুল। এই সময় কোনও দিগন্ত ছোঁয়া মাঠের বুকে দাঁড়ালে গোধূলি দেখতে পাওয়া যেত। আকাশের চেহারা দ্যাখ। কত রং।'

'তুমি তো ঘরে বসে বই পড়ছিলে।'

'ভাগ্যিস তুই ডাকলি।' বাবা আকাশ দেখছিলেন।

'বাবা!' অবন্তীর গলার স্বর বদলে গেল। নিজের কাছে অচেনা ঠেকল।

'বল।' বাবা মুখ নামালেন।

'একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার একজনকে ভালো লেগেছে।'

ভালো—। ও। ছেলেটি কে? ' কমলাকান্তর মুখে আগ্রহ।

'স্বর্ণেন্দু।'

'স্বর্ণেন্দু? এ তো ভাল কথা। খুব ভালো ছেলে ও।'

'তুমি আপত্তি করছ না তো?'

'আরে না। স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে তোর কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' অবন্তী অন্যদিকে তাকাল, 'ওর মা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'তাই নাকি? ওরা তো গুসকরাতে থাকেন। এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মা, তোমার এম. এ পরীক্ষা পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করতে হবে।'

ওরা চাইছেন অঘ্রাণে মাসে—।'

'ইম্পসিবল। প্রথম কথা, এখন তোর মন দিয়ে পড়ার সময়। বিয়ে হলে নানান চাপ মানের ওপর পড়বে ফলে পড়াটাই হয়ে উঠবে না। হয়তো পরীক্ষা দিবি কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিয়ে দিতে গেলে আমায় তো একটু গুছিয়ে নিতে হবে। তার জন্যে কিছু সময় দরকার। আমার কথা বুঝতে পারছিস?'

নীরবে মাথা নেড়েছিল অবন্তী।

'কিন্তু আমরা একটা কাজ করতে পারি। ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলে সম্বন্ধটা পাকা করে রাখতে তো দোষ নেই।'

'তুমি যা বলবে তাই হবে।'

বাবা ডান হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি মা। এর চেয়ে ভালো খবর আমার জীবনে কিছু নেই। তোর দুই ভাই এখন ছোট। বেশ ছোট। ওরা নিজের পায়ে যখন দাঁড়াবে তখন আমি পৃথিবীতে থাকব কি না জানি না তবে তুই যে এখানে সুখী হবি তা আমি জেনে যেতে পারছি। এটা কম আনন্দের নয়। চল, তোর মাকে খবরটা দিই।'

মা কিছু সেলাই করছিল, বাবার কথা শুনে বলল, 'স্বর্ণেন্দু?'

'খুব ভালো ছেলে। আমার স্কুলে পড়া। এ বাড়িতে একবার এসেছিল, তুমি তো দেখেছ। সংসারে মা ছাড়া কেউ নেই। এমন পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

সেই তিনটে দিন, স্বর্ণেন্দু তাকে একবারও বলেনি, ভালোবাসি। তার পক্ষে তো সম্ভবই ছিল না অথচ কেমন করে যেন দুজনেই বুঝে গেল, শুনে ফেলল না—বলা কথাটা। বাড়িটা ছোট। দুটো ঘরের লাগোয়া উঠোন এবং সেখানে একটা ডুমুর গাছ রয়েছে। ভাড়া নিয়েছে স্বর্ণেন্দু। শান্ত, ছোটখাটো চেহারা প্রৌঢ়া মহিলাটি দরজা খুলে হাসলেন, 'এই বুঝি অবন্তী?'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'হ্যাঁ মা।'

'এসো মা।' ভদ্রমহিলা হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসালেন। তারপর কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাঃ।'

অবন্তী মুখ নামাল। সে সুন্দরী নয় এ কথা মায়ের মুখে অনেকবার শুনেছে। বাবা বলেন, 'বাড়াবাড়ি সুন্দরী হলে তো বিপদ, তারা আবার বর খুঁজে পায় না।' অতএব এই মহিলা তার তার রূপের প্রশংসা করলে মন রাখার জন্যে করছেন।

স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'বাঃ মানে?'

'এই মেয়ের মুখে এমন কিছু আছে যা সাধারণ বাঙালি মেয়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। ওকে গোঁজামিল দিয়ে কিছু বোঝাতে পারবি না।'

অবন্তী হেসে ফেলেছিল।

মহিলা বললেন, 'তোমাদের বাড়ির কথা শুনেছি। তোমার বাবা ওকে খুব স্নেহ করেন। একদিন ওর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।'

'বাবাকে বলব।' অবন্তী বলেছিল।

'বি এ পাশ করে কী করবে? এম.এ ?'

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ গল্প হয়েছিল সেদিন। স্বর্ণেন্দুর মাকে ভালো লেগেছিল অবন্তীর। কোনও কোনও মহিলা খুব দ্রুত আপন করে নিতে পারেন, দূরত্ব রাখেন না, ইনি সেই ধরনের। চা খাবার খাইয়ে জেনে নিলেন অবন্তী রান্না করতে পারে কি না, গান জানে কি না। সময়টা চমৎকার কেটেছিল।

ফার্স্ট ক্লাস অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল অবন্তীর। বাবা বললেন, 'হাতশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। এম-এটা মন দিয়ে পড়ো। ওখানে ফার্স্ট ক্লাস পেলে আমি খুশি হব।'

বাবার ইচ্ছে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবন্তীকে পড়াতে। কিন্তু খরচের কথা ভেবে অবন্তী নিজেই রাজি হয়নি। তার জন্যে পরিবারের সবাই বঞ্চিত হবে এটা কখনই চায়নি সে।

ওই সময় একটা মজার খেলা খেলত সে। কাগজে অর্নাস গ্র্যাজুয়েটদের সুযোগ আছে এমন চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলেই দরখাস্ত করে দিত। অবশ্য যে সব দরখাস্তের সঙ্গে টাকা পাঠাতে হত না সেগুলোকেই বেছে নিত সে। একটা খাতায় লিখে রাখত কোথায় দরখাস্ত পাঠিয়েছে। সেই সব দরখাস্তের কোনও উত্তর আসত না। একদিন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে কার্ড করিয়ে এল কাউকে না বলে। চাকরি পাওয়া যে অত্যন্ত কঠিন কর্ম সেটা সে এম. এ ক্লাসে থাকার সময় বুঝে গিয়েছিল। হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে একটা সরকারি খাম এল, আপার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরির জন্যে তাকে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। পরীক্ষা হবে বর্ধমানেই। অবন্তী খুব উত্তেজিত হলেও কাউকে বলতে চাইল না ঘটনাটা। পরীক্ষায় হাজার হাজার প্রার্থী বসবে, চাকরি না হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে নব্বইভাগ সেখানে সবাইকে জানিয়ে হাস্যাস্পদ হওয়ার দরকার কী! তা ছাড়া এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার চেষ্টা না করে সে খেলাচ্ছলেও চাকরি খুজছে জানতে পারলে বাবা খুব দুঃখ পাবেন। তাই চুপিসারে পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল সে। দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিল প্রশ্নগুলোর উত্তর ক্লাস টেনের পড়ুয়া স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবে। এদেশে একজন আপার ডিভিশন ক্লার্কের মান ক্লাস টেনের অথচ আবেদন করতে বলা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েটদের।

তখন রোজ দেখা করতে ইচ্ছে করত। কিন্তু স্বর্ণেন্দু বলেছিল সেটা ঠিক হবে না। বরং পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে কমলাকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলা দরকার। প্রয়োজন হলে স্বর্ণেন্দুর মা যাবেন ওর কাছে।

অবন্তী মাথা নেড়েছেল, 'যাঃ। উনি যাবেন কেন?'

'তা হলে আমাকেই যেতে হয়।'

'না। বাবাকে আমিই বলব।'

'প্রাইভেট টিউশানি করে?'

'কেন?'

'নইলে তো মেয়ের অবস্থা আমার মতো হবে।'

'আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল। এক্ষেত্রে মেয়ে নিজে পছন্দ করেছে। ওর অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল হবে।' কমলাকান্ত হেসেছিলেন।

মা মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ব্রাহ্মণ?'

কমলাকান্ত বললেন, 'আজকাল আবার জাত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?'

'ও, তার মানে নিচু জাতের ছেলে।'

'নিচু জাত মানে? অর্ধেক ব্রাহ্মণ, বদ্যি।'

'যা ইচ্ছে তাই করো।'

'তুমি খুশি হওনি বলে মনে হচ্ছে!'

'ভাটপাড়ায় যখন খবরটা যাবে তখন কী হবে ভাবতে পেরেছ?'

'কিছুই হবে না। এখন ভাটপাড়ার ভটচার্যিরা আর আগের মতো গোঁড়া নন। সেনগুপ্ত শুনলে তাঁরা তোমাকে বয়কট করবেন না।'

মায়ের বাপের বাড়ি ভাটপাড়ায়। বিয়ের আগেই তার মা-বাবা মারা গিয়েছিলেন।

কাকারা বিয়ে দেয়। বিয়ের পর বড় জোর চারবার মা ভাটপাড়ায় গিয়েছে। অবন্তীর যখন চারবছর বয়স তখন শেষবার গিয়েছিল মা। সেই স্মৃতি অবন্তীর ঝাপসা। তবু জাতের প্রসঙ্গ এলে মায়ের মানে ভাটপাড়ায় কৌলিন্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

রাত্রে একা পেয়ে মা তাকে বোঝাচ্ছিল, 'তুই যেভাবে মানুষ হয়েছিস, যেসব নিয়ম শিখেছিস তার সঙ্গে মিলবে এমন ঘরে তোর যাওয়া উচিত। ছেলেটা হয়তো ভাল কিন্তু বদ্যিদের কোনও নিয়মকানুন নেই। ওরা কোনও কিছু মানে না। শুনেছি বিছানায় বসেই মাছ মাংস খায়। তোর এসব সহ্য হবে?'

অবন্তী হেসেছিল, 'মা তুমি জান না, একসময় বলা হত বাঙালিদের মধ্যে বদ্যিরাই শিক্ষার দিক দিয়ে সব চেয়ে এগিয়ে, মানুষ শিক্ষিত হলে আর যাই হোক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয় না।'

মা আর কথা বাড়ায়নি। স্বাভাবিক হতে তার দুদিন সময় লেগেছিল। এক বিকেলে বাড়ি ফিরে কমলাকান্ত মেয়েকে ডাকলেন, 'অবু আজ স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে কথা হয়ে গেল।'

কয়েকদিন দেখা হয়নি, অবন্তী বাবার দিকে তাকাল।।

কমলাকান্ত বললেন, 'আজ টিচার্স রুমে আমরা দুজনই ছিলাম। তাই সুযোগ পেয়ে ওকে বললাম ওর মাকে বুঝিয়ে বলতে বিয়ের আগে এম. এ. পরীক্ষাটা দেওয়া দরকার। বিয়ের পর মেয়েদের জীবনে যেসব পরিবর্তন ঘটে থাকে তাতে মনঃসংযোগের বিঘ্ন ঘটাই স্বাভাবিক। যদি সে মনে করে আমার গিয়ে তার মাকে বুঝিয়ে বলা উচিত তা হলে আমি যেতে রাজি আছি। তা স্বর্ণেন্দু তো এক কথায় সব মেনে নিল। বলল, আপনি ঠিকই বলছেন। আপনি কেন একথা বলতে যাবেন, আমিই মাকে বলব। মা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবেন।

কমলাকান্ত হাসলেন। যেন বিরাট একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। অবন্তীর ভালো লাগছিল না কিন্তু প্রতিবাদ করারও কোনও কারণ ছিল না। নিমপাতার তেতো অথবা ইনজেকশনের ব্যথা মেনে নেওয়া ছাড়া তো কোনও উপায় নেই। কিন্তু অবন্তীর মনে অকস্মাৎ অভিমান জন্মাল। সেই অভিমানের মুকুল থেকে গাছ হতে বেশি সময় লাগল না। কমলাকান্ত তাঁর মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনও প্রস্তাব রাখতেই পারেন কিন্তু স্বর্ণেন্দু সেটা মেনে নেবে কেন? সে তো জোর দিয়ে বলতে পারত বিয়ের পরেও অবন্তীর পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত হবে না। তা না বলে সে মেনে নিল প্রস্তাবটাকে? অর্থাৎ ওর দিক থেকে কোনও তাড়া নেই। সে যদি অপেক্ষা করতে পারে অবন্তীরও বা পারবে না কেন? শুধু অপেক্ষা করা নয়, এই সময় দেখা না করেও তো সে থাকতে পারবে। কেন পারবে না?

দিন দশেক সময় যেমন যায় তেমনই গেল। অবন্তী বুঝতে পারছিল তার পক্ষে জেদ বজায় রেখে দূরে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। এই যে গতকাল স্বর্ণেন্দু কমলাকান্তর সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিল, আর তখনই অবন্তীর এমন মাথা ব্যথা ধরে গেল যে সে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারল

না।

পরপর দুদিন ছুটি। কমলাকান্ত মেয়েকে ডাকলেন, 'নে তৈরি হয়ে নে।'

'কেন?' অবন্তী অবাক। বাবার এমন মুড সে অনেক দিন দ্যাখেনি।

'শান্তিনিকেতনে যাব। তুই সঙ্গে চল।'

'হঠাৎ'

'কদিন থেকে মনে হচ্ছে যাই ঘুরে আসি। সকাল সকাল গিয়ে সন্ধেবেলায় ঘুরে আসব ওখানেই দুপুরে খেয়ে নেব।'

'মাকে নিয়ে যাবে তো? ভাইদের তৈরি হতে বলব?'

'নারে। লটবহর নিয়ে এবার ওখানে যাব না। তুই আর আমি কিছুক্ষণ ছাতিমতলা, শ্যামলীর সামনে কাটিয়ে আসি বুঝলি?'

মা শুনে বলেছিল, 'এম্মা এভাবে যাওয়ার কোনও মানে হয়? গেলাম আর চলে এলাম তা ছাড়া ওখানে দেখার কী আছে? পুরী বা দেওঘর হলে যাওয়া যেত।'

বর্ধমানের এত কাছে শান্তিনিকেতন কিন্তু সেই বালিকা বয়সে মাত্র একবারই গিয়েছিল অবন্তী। অতএব উৎফুল্ল হল তার জীবনের মাত্র কয়েকটি সুখস্মৃতির অন্যতম হল এবারের শান্তিনিকেতন যাত্রা।

ভাইদুটোর দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বেরাবোর সময় কাঁতর চোখে তাকিয়েছিল ওরা। দিদি বাবার সঙ্গে কোথাও একটা যাচ্ছে এবং তাদের যাওয়া হচ্ছে না বলে সকাল থেকে বায়না করে মায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। বাসে চেপে বোলপুরে নেমে কমলাকান্ত যখন বললেন, 'আয় খেয়ে নিয়ে রিকসায় উঠব' তখন অবন্তী বলেছিল, 'না। পরে খাব'।

কমলাকান্ত জোর করেননি। সেসময় বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার রাস্তাটা ঘিঞ্জি হয়নি তেমন। বোলপুর যখন শান্তিনিকেতন হয়ে গেল তখন আপনা থেকেই টের পেয়ে গেল অবন্তী। কমঅকান্ত বললেন, 'এই হল ভুবনডাঙার মাঠ।'

সেদিনটায় খিদে পায়নি। উদয়ন, শ্যামলী, কলাভবন, ছাতিমতলা দেখে দেখেও মন ভরেনি দেখা হল না শ্রীনিকেতন, প্রান্তিক পেরিয়ে কোপাই। শেষ বিকেলে বোলপুরে ফিরে এসে একটা পাইস হোটেলে ঢুকে ভাত খেলেন কমলাকান্ত। অবন্তী খাত খায়নি। দুটো রুটি আর তরকারি খেয়েছিল। খেতে খেতে কমলাকান্ত বলেছিল, 'কতদিন আগে উনি চলে গেছেন, সেই একচল্লিশ সালে, অথচ আজ ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল তিনি আছেন। যে কোনওমুহূর্তেই সামনে এসে দাঁড়াবেন। ভগবান টগবান সব বাজে ব্যাপার, বুঝলি, কখনও কখনও এক একজন মানুষ ভগবান হয়ে যান। যেমন যিশুখ্রিষ্ট, যেমন রবীন্দ্রনাথ।'

স্বর্ণেন্দুর কথা মনে পড়েছিল তখন। স্বর্ণেন্দু বলেছিল, 'গীতবিতান আমার কাছে গীতার চেয়ে পবিত্র গ্রন্থ।'

অবন্তী পাইস হোটেলে বসে স্থির করল, রবীন্দ্রনাথের সব লেখা পড়তে হবে। এখন যা জানে তা ভাসা ভাসা। ওই জানা নিয়ে কথা বলা যায় না।

বর্ধমানে ফেরার সময় বাসে বসে কমলাকান্ত বললেন, 'যাঃ, অ্যাসিড হয়ে গেছে। বুক জ্বলছে।'

অবন্তী বলল, 'অবেলায় ভাত ডাল খেয়েছ। কষ্ট হচ্ছে?'

'তেমন নয়।'

কিন্তু বর্ধমানে বাস থেকে নেমে তিনি পানের দোকান থেকে সোডা কিনে খেলেন। কয়েকটা ঢেঁকুর উঠল। বললেন, 'ব্যাস, ঠিক হয়ে গেল। চল।'

বাড়ি ফিরে বাবা বললেন, 'রাতে আর কিছু খাব না।'

মা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আর কেন? লোড হল। অবেলায় হোটেলে খেলাম।' বাবা হাসলেন, 'জানান তো দেবের।'

সেই রাত অবন্তীর জীবনটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। রাত এগারোটায় মায়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙেছিল অবন্তীর। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখেছিল বাবা বুকে হাত চেপে বসে

ছটফট করছে, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। মা পাখা দিয়ে হাওয়া করে যাচ্ছে সামনে। অবন্তী দ্রুত বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী হয়েছে? ডাক্তার ডাকব?'

ওই অবস্থায় বাবা চোখ তুলেছিলেন। যন্ত্রণায় তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। কাঁপা ঠোঁটে বললেন, 'এদের দেখিস।'

অবন্তী পড়ি কি মরি করে ছুটেছিল। গলির মোড়েই একজন ডাক্তার থাকতেন তাঁকে ঘুম থেকে তুলে যখন সঙ্গে নিয়ে ফিরছিল তখন যে পৃথিবীর পথগুলো জনশূন্য তা চেয়ে দেখার মন তার ছিল না।

দৃশ্যটি আজও মনে আছে। বাবা শুয়ে আছেন চিত হয়ে। মুখটা এক পাশে ফেরানো। তাঁর মাথার পেছনে বসে মা সমানে হাওয়া করে যাচ্ছে। ডাক্তার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?'

মা বলল, এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

চেয়ার এগিয়ে দিল অবন্তী। ডাক্তার সেখানে বসে নাড়ি টিপতেই সোজা হয়ে গেলেন। স্টেথো বের করে বুকে চাপলেন। তারপর কান নিয়ে গেলেন বুকের ওপর। সেটা দেখেই অবন্তীর সমস্ত শরীর যেন রক্তশূন্য হয়ে গেল।

ডাক্তার বেশ কয়েকবার বুকে আঘাত করে হৃৎপিণ্ড সচল করার চেষ্টা করলেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'উনি নেই।'

মায়ের আর্তনাদে পাড়ার মানুষ ছুটে এল। অবন্তীর গলা দিয়ে একটা স্বরও বের হচ্ছিল না। মানুষটি শুয়ে আছেন, অথচ তিনি নেই। এই চরম সত্যটি মেনে নেওয়া যে কতখানি কষ্টকর।

পরে এই কথাটা নিয়ে অবন্তী অনেক ভেবেছে। সেই বিকেলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাবা বলেছিলেন, তিনি চলে গেছেন তবু মনে হচ্ছিল তিনি আছেন। কোনও কোনও মানুষ তাঁর কাজের জন্যে এইভাবে সময়কে হারিয়ে থেকে যান। বাবা সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি থাকবেন বা কোথায়। কথাটা ঠিক হল না। অবন্তী যত দিন পৃথিবীতে থাকবে তত দিন তিনি বেঁচে থাকবেন। মাঝেমাঝেই খুব একলা লাগে যখন তখন অবন্তীর মনে তিনি এসে যান। অদ্ভুত একটা উত্তাপের স্পর্শ পায় তখন অবন্তী। নিজেকে সেই মুহূর্তে একলা মনে হয় না।

পাড়ার যেসব ছেলের সঙ্গে আলাপ ছিল না, আত্মীয় যারা নিয়মিত আসা যাওয়া করত না, সকাল না হতেই তারা হই হই করে কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিল। শ্মশানে যেতে হবে। সৎকার করা হবে। প্রতিবেশিনীদের কেউ কেউ মাকে জড়িয়ে বসেছিলেন। হেমন্ত বসন্ত ভয়ে জড়সড় হয়েছিল। তাদের ডাকল একজন। শ্মশানে যেতে হবে। মুখাগ্নি করতে হবে বড় ছেলেকে। বালক হেমন্ত যেতে চাইছে না। সবাই তাকে বোঝাচ্ছে, ভয় নেই। ছেলে হিসেবে এটা সবাইকে যেমন করতে হয় তাকেও করতে হবে।

অবন্তী বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'ও থাক, আমি মুখাগ্নি করব।'

লোকগুলোর মুখের চেহারা আচমকা বদলে গেল।

একজন বলল, 'ছেলে থাকতে মেয়ে মুখাগ্নি কেন করবে?'

'এখানকার শ্মশানে মেয়েরা যায় না।'

'শ্মশানে মেয়েদের যাওয়া উচিত নয়।'

'ছেলে বংশ রক্ষা করবে, তারই কাজ করা উচিত।'

সংলাপগুলো তীরের মতো ছুটে আসছিল। একজন শুরু করতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিজের নিজের জ্ঞানের নমুনা রাখতে।

অবন্তী চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। ওরা থামতেই সে জিজ্ঞাসা কলল, 'আপনাদের কথা বলা শেষ হয়েছে? বেশ, আপনারা এতক্ষণ যা বললেন তা কোন বইতে লেখা আছে দয়া করে বলুন।'

কেউ জবাব দিল না।

অবন্তী বলল, 'আমি ওর সন্তান। ওঁর সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল। মুখাগ্নি করা যদি শাস্ত্রমতে পবিত্র কাজ হয় তা হলে সেটা করার অধিকারী আমি। আর কেউ নয়। চলুন আপনারা।'

শ্মশানে পৌঁছে একটার পর একটা বাধা পেরিয়ে সেই সময়টায় অবন্তী পৌঁছল যখন পুরোহিত তাকে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করার পর চালকলার ডেলা খাইয়ে দিতে আদেশ করল। এর চেয়ে নিষ্ঠুর

কোনও অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারে না অবন্তী। মৃত মানুষের মুখ হাঁ করে তার মধ্যে পিণ্ড গুঁজে দেওয়া যে কী-বীভৎস ব্যাপার তা এর আগে কেউ উপলব্ধি করেনি? কেউ প্রতিবাদ করেনি? এই যদি হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানের নমুনা হয় তা হলে নিজেকে হিন্দু না ভাবতে আর কোনও আপত্তি নেই। অবন্তী অস্বীকার করেছিল।

শ্মশানযাত্রী এক বয়স্ক মানুষ বললেন, 'মা এটা করতে হয়, এই পিণ্ড ওঁর শরীরের জন্যে নয়, ওঁর আত্মাকে শান্ত করতে। জীবিত অবস্থার কথা এখন ভেবো না, এই যে একটু বাদে ওঁর মুখে আগুন ছোঁয়াবে, তা কি তুমি জীবিত অবস্থায় ভাবতে পারতে? এসবকে প্রতীক হিসেবে ধরে নাও।'

মানুষের জীবনযাপন সংহত করতে ধর্মের প্রয়োজন হয়েছিল। কোনও ধর্ম কট্টর কোনও ধর্ম উদার। যারা হিন্দু তাদের অবস্থাটা বেশ মজার। জ্ঞান হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত যে মানুষটি একবারও মন্দিরে গেল না, কোনও পুজাআর্চনা করল না, গীতা বেদ বা মন্ত্র উচ্চারণ করল না, নিজের মতো জীবন যাপন করল, তার মৃত্যুর পর সৎকার করার সময় হিন্দুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে শ্মশান-যাত্রীদের মধ্যে। মন্ত্র পড়ে শ্রাদ্ধ করে তার আত্মাকে স্বর্গে পাঠাতে হবে। আর এসবকে যারা সমর্থন করবে না তাদের বোঝানো হবে প্রতীক হিসেবে ধরতে। প্রতীক হিসেবে ধরলে নানান গোঁজামিল পার পেয়ে যায়।

খবর পেয়ে স্বর্ণেন্দু এসেছিল। অবন্তীর মনে হয়েছিল শ্মশানে গিয়ে, স্বর্ণেন্দু আসেনি। ওদের স্কুলের মাস্টারমশাইরা সবাই এসেছেন। তারা থেকেছেন শেষ পর্যন্ত। স্বর্ণেন্দু কেন আসেনি তা জানতে কাউকে প্রশ্ন করেনি অবন্তী। প্রশ্ন করার মতো মন ছিল না।

সে এল দুদিন বাদে। মায়ের পাশে বসে বলল, 'আমি দেশে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে খবরটা পেয়ে বিশ্বাস করতে পারিনি।'

মা কিছু বলল না। অবন্তী দাঁড়িয়েছিল কিছু দূরে, চুপচাপ। খানিকক্ষণ পরে স্বর্ণেন্দু বলেছিল, 'এইসময় কোনও কথা বলাই বাহুল্য। তবু, আমাকে দিয়ে কোনও কাজ যদি হয়, বলবেন, সংকোচ করবেন না।'

মা বলেছিল, 'আজ বাদে কাল ওঁর কাজ। যা পেতেন উনি তাই খরচ করতেন। রেখে যাননি কিছুই। কী যে হবে।'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। স্কুল থেকে ব্যবস্থা করা হবে বলে শুনেছি। তা ছাড়া আমরা তো সবাই আছি।'

স্বর্ণেন্দু চলে যাওয়ার সময় অবন্তী এগিয়ে দিতে গেল।

স্বর্ণেন্দু নিচু গলায় বলল, 'শক্ত হও।' তারপর চলে গেল।

স্কুল থেকে সাহায্য এসেছিল। কমলকান্তের পারলৌকিক অনুষ্ঠানগুলো শাস্ত্রমতে সুসম্পন্ন হয়েছিল। মেয়ে বাবার শ্রাদ্ধ করছে এই খবর বর্ধমানে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। দু-একজন বয়স্কা মহিলা যেচে বাড়িতে এসে বলে গিয়েছিলেন, 'আমরা যা পারিনি তুমি তা করেছ। এরপর নিশ্চয়ই আর কেউ বাধা দিতে সাহস পাবে না।'

নিয়মভঙ্গের দিন শ্মশানযাত্রীদের বলা হয়েছিল। স্কুলের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে স্বর্ণেন্দু এসেছিল। পাড়ার ছেলেরাই পরিবেশন করেছিল। স্বর্ণেন্দু বলেছিল, 'আমি তো শ্মশানযাত্রী নই, তাই আজ আমি না খেলে মাস্টারমশাই-এর আত্মার অকল্যাণ হবে না।'

মা খবরটা শুনে এগিয়ে এসেছিল, 'উনি তোমাকে খুব স্নেহ করতেন। তুমি খেলে উনি খুশি হবেন।' স্বর্ণেন্দু রাজি হয়েছিল।

এই পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা মাস্টারমশাইদের অজানা নয়। কিন্তু তাদের স্কুলে কোনও ছাত্রী নেই ফলে শিক্ষিকা নিয়োগ করার কোনও সুযোগ হচ্ছে না। অবন্তীর একটা চাকরি পাওয়া দরকার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মাস্টারমশাইরা আলোচনা করতে করতে থেমে গেলেন কারণ তাঁরা কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। স্বর্ণেন্দু চুপ করে বসেছিল। এই সময় পিওন এল।

বাড়ির সামনে যে খোলা জমিটা পড়ে থাকত সেখানেই চারদিক ঘিরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। মেয়েদের ব্যাচ খাচ্ছিল তখন। অবন্তী একপাশে দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেদের উৎসাহ দেখছিল। পরিবেশন করার সময় বিয়েবাড়ি আর শ্রদ্ধাবাড়ির তফাত ওরা করে না। মৃত মানুষের

শ্রাদ্ধের খাওয়া দলবেঁধে এসে খেয়ে যেতে কারও কোনও অস্বস্তি নেই। এ ব্যাপারে সে আপত্তি করেছিল। কিন্তু আপত্তিটা টেঁকেনি। মা বলেছিল, 'শ্রাদ্ধের খাওয়া না খাওয়ালে তোর বাবার আত্মা শান্তি পাবে না।' মৃত মানুষের আত্মা কীসে শান্তি পায় জীবিত মানুষেরা সেটা জেনে ফেলেছে।

ন্যাড়ামাথা হেমন্ত এসে বলল, 'এ্যাই দিদি, তোর নামে চিঠি এসেছে।'

কমলাকান্তের মৃত্যুর খবর পেয়ে দূরের আত্মীয় বা তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ চিঠি লিখে সমবেদনা জানাচ্ছিলেন। সেইরকম কারও চিঠি ভেবে অবন্তী বলল, 'দে।'

'তোকে সই করে নিতে বলছে।'

অবন্তী অবাক হল। পিওন দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনে।

'আপনি অবন্তী চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে সই করুন।'

সই করার পর একটা ব্রাউন রঙের খাম হাতে দিয়ে পিওন চলে গেল। খামটায় মুখ ছিঁড়তেই যে কাগজটা বেরিয়ে এল তাতে ছিল অবন্তীর জন্যে একটি চাকরির নিশ্চয়তা। সেই কবেকার দেওয়া পরীক্ষার ভিত্তিতে সরাসরি আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে তাকে নিয়োগ করেছে এক সরকারি দপ্তর। আপাতত অস্থায়ী হিসেবে থাকতে হবে তাকে। এবং এই চিঠি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যেই তাকে চাকরিতে যোগ দিতে হবে। তার কর্মস্থল কলকাতা।

অবন্তী চোখ বন্ধ করল।

একজন বয়স্ক প্রতিবেশী এগিয়ে এলেন, 'কী হল? কোনও খারাপ খবর?'

অবন্তী মাথা নেড়েছিল, 'না। আমি একটা চাকরি পেয়েছি।' খুব নিচু গলায় কথাগুলো বলতেই ভদ্রলোক চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন চিঠিটা। তারপর নজর বুলিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'বাঃ। গুড। একটু আগেই মাস্টারমশাইরা তোমার চাকরি নিয়ে চিন্তা করছিলেন। একেই বলে কাকতালীয় ব্যাপার।'

কথাগুলো শুনে মাস্টারমশাইরা চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন।

সম্ভবত মুহূর্তেই সমস্ত পাড়া জেনে গেল মাস্টারমশাই-এর শ্রাদ্ধের দিনেই তার মেয়ে চাকরি পেয়েছে। যে সে চাকরি নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের আপার ডিভিশন ক্লার্ক। শ্রাদ্ধবাসরের চেহারা দ্রুত বদলে গেল। অবন্তী তাকাল স্বর্ণেন্দুর দিকে। খুশিতে ওর মুখ এখন কীরকম নরম হয়ে গিয়েছে।

রাত্রে পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেলে কমলাকান্তের সদ্য বাঁধানো ছবির সামনে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অবন্তী। চশমার কাচের আড়ালে থেকেও কমলাকান্তের চোখ-দুটো কী উজ্জ্বল! সেই চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নিচু করল অবন্তী। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'আমি কী করব বাবা আমি বুঝতে পারছি না।'

অবন্তী যেন স্পষ্ট অনুভব করল কমলাকান্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এম. এ.-তে ফার্স্টক্লাশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি অবন্তীকে কোনও দিকে তাকাতে নিষেধ করেছিলেন। যে কারণে বিয়ে পিছিয়ে দিতেও দ্বিধা করেননি। চাকরি করতে যাওয়া মানে এ বছর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু—।

মা এল ঘরে, 'হ্যাঁরে, কত মাইনে দেবে লিখেছে?'

অবন্তী তাকাল, 'পে স্কেলটা লিখেছে, সঙ্গে ডি.এ. হাউসরেন্ট থাকবে।'

'কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে? বলেটলে বর্ধমানে চলে আসা যায় না?'

'আমি কিছুই জানি না মা।'

'সেই চেষ্টাই কর। কলকাতায় থাকা মানে সেখানেও খরচ করতে হবে।'

অবন্তী চুপ করে থাকল।

'ভগবান আছেন। আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। মানুষটার সঙ্গে এতকাল ঘর করলাম, ঘরের জন্যে তিনি কোনও দিনই ভাবেননি। কত লোক টিউশনি করে দোতলা বাড়ি তুলছে আর উনি? মোটা মোটা বই কিনেছেন মাইনের টাকায়। ওসব বই এখন কী কাজে লাগবে? মাস্টারমশাইরা বলে গেল স্কুলেও বেশি টাকা পাওনা নেই। যা আছে তাতে মাস তিনেক টেনেটুনে চলত। তারপর কী হবে ভেবে হাত পা কাঁপছিল আমার। দিনরাত ভগবানকে ডেকেছি। ওই বাচ্চা ছেলেদুটোর তো পড়াশুনাও হবে না। তা শেষ পর্যন্ত ভগবান আমার প্রার্থনা শুনলেন।' মা একটানা

বলে গেল।

অবন্তী মায়ের হাত জড়িয়ে ধরল, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মা।'

মা কোনও কথা বলল না।

অবন্তী বলল, 'বাবার ইচ্ছে ছিল আমি এম. এ. পরীক্ষা দিই।'

'তোর বাবার কোনও বাস্তবজ্ঞান ছিল না। এম. এ. পাশ করে কী করবি চাকরি খুঁজতে হবে। স্কুলের চাকরি পেলে তোর বাবার দশা হত। আর এটা সেন্ট্রাল গবমেন্টের চাকরি। একবার ঢুকলে রিটায়ার করার আগে চাকরি যাবে না।' মা জোর দিয়ে বলল, 'আমি ভাবছি অন্যকথা। কলকাতায় তুই কোথায় থাকবি?'

অনেককাল আগে বাবা একবার সবাইকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। তখন বসন্ত বছরখানেকের। একরাত হোটেলে ছিল ওরা। চিড়িয়াখানা যাদুঘর নয়, বাবা ওদের নিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড়ে। ওই যাওয়াটা যে মায়ের ইচ্ছেয় সেটা পরে বুঝেছিল অবন্তী। বর্ধমান থেকে কলকাতা এত কাছে কিন্তু আর যাওয়া হয়নি তার। গল্প-উপন্যাস আর খবরের কাগজে কলকাতার কথা পড়তে পড়তে অনেক জায়গার নাম জানা হয়েছে অবন্তীর।

মা বলল, 'আমার এক মাসতুতো বোনের বিয়ে হয়েছিল কলকাতার দর্জিপাড়ায়। ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলতাম। ওর নাম বাসন্তী।'

অবন্তী অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। মায়েরও তো একসময় ছেলেবেলা ছিল। মা কি খেলত? রুমালচোর? না এক্কাদোক্কা?

'তুই বাসন্তীকে একটা চিঠি লেখ।'

'তাঁকে বাবার মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়েছে?'

'কী করে জানাব? তোরা মাত্র একশোটা কার্ড ছাপিয়েছিলি।'

চোখ বন্ধ করল অবন্তী। একশো নয়, দুশো কার্ড ছাপিয়ে দিয়েছিলেন বাবার সহকর্মীরা। তার অনেকগুলো আর কাউকে পাঠাবার দরকার নেই বলে মা রেখে দিয়েছিল। চোখ খুলল অবন্তী, 'তুমি তার ঠিকানা জান?'

'জেনে নিতে কতক্ষণ! আমার কথা ও ফেলতে পারবে না।'

'আমার এসব ভালো লাগে না।'

'ভালো না লাগলে তোকে এখান থেকেই যাওয়া আসা করতে হবে। কত লোক তো বর্ধমান থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে, করে না?'

'করে।'

'তা হলে তুই তাই কর। খাওয়া থাকার টাকা বেঁচে যাবে।'

সকালবেলায় স্বর্ণেন্দু এল। অবন্তী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণেন্দুকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার? সাত সকালে?'

স্বর্ণেন্দু অবন্তীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মা বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে 'আবু আজ অফিসে যাচ্ছে।'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'ও।'

'কলকাতার কিছুই তো চেনে না, একটু বলে দাও তো কীভাবে ওর অফিসে যাবে? প্রথমদিন একটু অসুবিধে হবে ঠিকই, তারপর....।' মা কথা শেষ করল না।

'ও কি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করবে?'

'না করে উপায় কী!'

একটু বাদে অবন্তী বের হল। পা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বুকে দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ যেন স্পষ্ট। পাশে হাঁটতে হাঁটতে স্বর্ণেন্দু বলল, 'আজ আমি তোমাকে কোনও প্রশ্ন করব না।'

'কেন?'

'যে প্রশ্ন তোমাকে বিব্রত করবে সেটা করে কোনও লাভ নেই।'

অবন্তী মাথা নামাল।

স্টেশন অনেকটা দূরে। স্বর্ণেন্দু রিকশা নিল। তাদের রিকশায় পাশাপাশি বসতে দেখল

অনেকেই। রিকশা চলতে আরম্ভ করলে স্বর্ণেন্দু বলল, 'রোজ এতটা পথ যাওয়া আসা করতে তোমার খুব কষ্ট হবে।'

'কী করব?'

'তোমার উচিত কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করা।'

'কোথায় থাকব? আমার কোনও চেনা মানুষ নেই ওখানে।'

'মেয়েদের হোস্টেল রয়েছে, ওয়ার্কিং লেডিস হোস্টেল।'

'যারা আসা যাওয়া করে তাদের কি খুব কষ্ট হয়?'

'অফিস থেকে বাদুড়ঝোলা বাসে চেপে স্টেশনে এসে শুনবে ট্রেন নেই। তখন কী করবে? অনেকে মাঝরাতের পর বর্ধমানে ফিরে ভোর বেলায় আবার ট্রেন ধরতে যায়। ছেলেদের পক্ষে যদি কিছুকাল এটা করা সম্ভব মেয়েদের করা উচিত নয়।'

'কিন্তু অনেক টাকা বাঁচবে।'

'আত্মহত্যা করলে কি তুমি কারও উপকারে লাগতে পারবে?'

অবন্তী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল স্বর্ণেন্দুর দিকে।

কোথায় টিকিট ঘর, টিকিটের দাম কত? মাস্থলি যদি করতেই হয় তা হলে কীভাবে করতে হবে দেখিয়ে নিজের দুটো টিকিট কাটল স্বর্ণেন্দু।

'দুটো টিকিট কাটলে যে?

'নিজের স্বার্থে।'

'তার মানে?'

'কলকাতায় গিয়ে যদি তুমি হারিয়ে যাও, যদি আর কখনও ফিরে না আসো তা হলে আমারই ক্ষতি।' হাসল স্বর্ণেন্দু।

অবন্তী হাসি চাপতে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

কোনটা লোকাল ট্রেন, কোনটা মেইল, কে আগে পৌঁছায় কলকাতায়, এসবের প্রথম পাঠ অবন্তী পেয়েছিল স্বর্ণেন্দুর কাছে। ফাঁকা লোক্যাল ট্রেনে চেপে যে আনন্দ হয়েছিল কয়েকটা স্টেশন যাওয়ার পর সেটা উধাও। মানুষ যে ওইরকম ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কখনও জানত না অবন্তী।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে মনে হয়েছিল একা এলে সে কোথাও বেরুতে পারত না। মানুষ, অজস্র মানুষ, সবাই একসঙ্গে ছুটে যাচ্ছে। পৃথিবী জনশূন্য হয়ে গেলে যতখানি জনপূর্ণ হলে তার চেয়ে হয়তো অনেক বেশি ভয়ংকর হয়ে যাবে। রাজভবনের পাশের সরকারি অফিসে পৌঁছে স্বর্ণেন্দু বোর্ড দেখে বলল, 'তোমার অফিস তিনতলায়। ওটা খুঁজে নিয়ে নিজে রিপোর্ট করো। আমরা যাওয়া ঠিক হবে না। যদি আজকেই কাজ শুরু করতে হয় তা হলে নীচে নেমে এসে আমাকে জানিয়ে যেয়ো। আমি এখানেই আছি।'

'তা হলে কী করবে?'

'দেখি।'

'তুমি তো স্নানখাওয়া করে আসোনি!'

'আমি তো জানতাম না কলকাতায় আসতে হবে।'

'তা হলে?'

'আরে এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। কোথাও ম্যানেজ করে নেব। যাও, দশটা বেজে গেছে। উইশ ইউ গুড লাক!'

তিনলায় পৌঁছে কাগজপত্র জমা দিয়ে খাতায় নাম তুলতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। তার নামে একটা ফাইল খোলা হলো। জন্মতারিখ থেকে শেষ পড়াশুনার সার্টিফিকেট সবই যাচাই করে নেওয়া হল। তারপর সুপারভাইসার অবন্তীকে নিয়ে গেলেন যে সেকশনে তার নাম স্ট্যাটিসটিক। বললেন, 'এখানেই কাজ শুরু করুন। মিস্টার সেন, এই মেয়েটি আজই জয়েন করল। কাজকর্ম দেখিয়ে দেবেন।'

মিস্টার সেন একমাথা টাক নিয়ে বললেন, 'কী ভেবেছেন বলুন তো? এটা কি নার্সারি? উটকো লোক এনে ঢোকাচ্ছেন, আমি কাজ শেখাচ্ছি আর সে সেটা শিখে অন্য সেকশনে চলে যাচ্ছে?

আমি যখন থাকব না তখন দেখব আপনাদের রিপোর্ট কি ভাবে তৈরি হয়।'

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে চলে যেতে মিস্টার সেন তাকালেন তার দিকে, 'নাম কী?'

'অবন্তী চ্যাটার্জি।'

'অবন্তী? আমার জানাশোনা কোনও মেয়েছেলের অবন্তী নাম নেই। প্রাচীন নাম সব ফিরে আসছে। কিন্তু অবন্তীর সঙ্গে চ্যাটার্জি মানাচ্ছে না, চট্টোপাধ্যায় বলবেন। বসুন। যোগবিয়োগ জানেন?'

মেয়েছেলে শব্দটায় তীব্র আপত্তি ছিল অবন্তীর। ওই শব্দটা উচ্চারণ করার সময় ভদ্রলোকের নাকটা এমন কুঁচকে গিয়েছিল যেন আরশুলা ছুঁয়েছেন। কিন্তু তার পরের কথাগুলো শুনে মনে হয়েছিল লোকটা একটু অন্যরকম।

সে চেয়ারে বসে বলল, 'আমি নতুন, আজই প্রথম এসেছি।'

'সেটা তো শুনলাম।'

'সেইজন্যেই আপনার কথার প্রতিবাদ করব না।'

'প্রতিবাদ? আই বাস্। ছাত্র ইউনিয়ন করতেন নাকি?'

'না।'

'তা হলে? প্রতিবাদ করার মতো কোনও কথা শুনেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—।'

'নো কিন্তু। বলে ফেলুন।'

'মেয়েছেলে শব্দটা আর বলবেন না।'

'সেকী? কথাটা খারাপ নাকি। ছেলেবেলা থেকে বাপঠাকুরদার মুখে শুনে আসছি।' ভদ্রলোক হাঁ হয়ে গেলেন।

'আপনাকে ব্যাটাছেলে বললে শুনতে ভাল লাগবে?'

'কেউ বলে না। তবে ব্যাটাছেলে মানে গৌরবের ব্যাপার।'

'মেয়েছেলে মানে আপনি অবজ্ঞা করছেন।'

'পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়েছিল?'

'মানে?'

'সরকারি চাকরি পাওয়ার আগে পুলিশকে জানানো হয়ে থাকে যাকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে তার সম্পর্কে খোঁজ খবর করে রিপোর্ট দিতে। পুলিশ কি আপনার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?'

'না।'

'যাবে। গিয়ে যে সব কথা বলবে সেগুলো হজম করবেন। না করলে তারা যে রিপোর্ট দেবে তাতে চাকরিটা চলে যাবে। তবে হ্যাঁ, আমি আর কখনও মেয়েছেলে শব্দটা উচ্চারণ করব না। বুঝলেন?'

'ধন্যবাদ। কিন্তু এখন থেকে আপনি আমাকে তুমি বলবেন।'

মিস্টার সেন চশমা খুলে তাকালেন, 'থাকো কোথায়?'

'বর্ধমানে।'

'সেখান থেকে একাই এসেছ?'

'না। সঙ্গে একজন এসেছেন।'

'তিনি কোথায়?'

'নীচে।'

'আশ্চর্য! তাঁকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে। বলে দাও চারটের সময় এসে তোমাকে নিয়ে যেতে। প্রথম দিন, অফিসছুটির ভিড় শুরু হওয়ার আগেই চলে যেয়ো।'

প্রথম দিনের কাজকে ছেলেখেলা বলে মনে হয়েছিল অবন্তীর। গোটা ষাটেক চালান থেকে নাম নম্বর আর টাকার অঙ্ক একটা মোটা খাতায় লিখতে হয়েছে তাকে। এই কাজটা একটা ক্লাস এইটের ছাত্রও করতে পারে।

দেড়টা নাগাদ মিস্টার সেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'টিফিন করবে না?'

'আমি কিছু সঙ্গে আনিনি।'

'তাতে কী হয়েছে! ক্যান্টিনে চলে যাও। সেখানে মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা আছে। দাঁড়াও।' চারপাশে তাকালেন মিস্টার সেন। দূরে একজন মধ্যবয়সিনী শ্লথ পায়ে এগিয়ে এলেন, 'আবার কী হল?'

'এই মেয়েটি আজ জয়েন করেছে। ওকে একটু ক্যান্টিনে নিয়ে যাবেন।'

মিসেস রায় তাকালেন। 'আজ শুরু?'

'হ্যাঁ।'

'এসো।'

ভদ্রমহিলার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে অবন্তী বুঝতে পারল উনি খুব পরিশ্রান্ত। অফিসে আসার সময় নিজের পোশাক সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন না। সায়া বেরিয়ে গেছে পায়ের কাপড় একটু উঠে যাওয়ার। জামার নীচে ঝুলে গেছে অন্তর্বাসের স্ট্র্যাপে।

ক্যান্টিনে গোটা পাঁচেক মহিলা বসেছিলেন গোল হয়ে। তাঁদের সামনে ভাত, ডাল, তরকারি এবং মাছ। খাওয়া এবং গল্প চলছিল। ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে অবন্তীকে দেখলেন।

মিসেস রায় খানিকটা দূরের টেবিলে বসে বললেন, 'আর একজন বাড়ল। তোমার নাম কী যেন?'

'অবন্তী চ্যাটার্জি।'

'বাড়ির অবস্থা কী রকম?'

'ভালো নয়।' অবন্তী মাথা নাড়ল।

'বুঝেছি। সঙ্গে খাবার এনেছ?'

'না।'

মিসেস রায় একটি ছেলেকে ডাকলেন। সে কাছে এলে বললেন, 'কী খাবে ওকে বলে দাও।' তারপর ব্যাগ থেকে টিফিনের কৌটো বের কররেন।

দাম জেনে শুধু টোস্ট আর চায়ের অর্ডার দিল অবন্তী।

'অত অল্পে পেট ভরবে? আমি অবশ্য ওদের মতো ভাত ডাল খেতে পারি না। রুটি তরকারি নিয়ে আসি।'

'এখানে ভাত ডাল পাওয়া যায়?'

'না! ওরা এক-একজন বাড়ি থেকে এক একটা আইটেম নিয়ে আসে। আমি ভাই ঘুম থেকে উঠি পাঁচটায়। হেঁসেলে যাই, পাঁচজনের পিণ্ডি তৈরি করে বের হই। চিড়িয়ামোড় থেকে বাসে ওঠা রেপ্ড হওয়ার চেয়ে খারাপ। বাড়ি ফিরি কিন্তু শুতে পাই না। আবার খ্যাঁটের জোগাড় করতে হয়। শুতে শুতে এগারোটা। আজকাল আর পারি না ভাই।'

'রান্নার লোক রাখেন না কেন?'

'না খেয়ে থাকব বলে? যা বাজার তাতে দুজনের রোজগারেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। ফ্ল্যাট কিনতে লোন নিয়েছি, সেটা শোধ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে, এর ওপর আবার হাতি পোষার কথা ভাবতে পারি না।'

টোস্ট এসে গিয়েছিল। মাখনের স্বাদ বিশ্রী।

চারটের সময় অবন্তী নীচে নেমে দেখল স্বর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে সুন্দর হাসল সে। জিজ্ঞাসা করল, 'প্রথম দিন কেমন লাগল?'

অবন্তী মাথা নাড়ল, 'ভেবেছিলাম খুব কঠিন কাজ করতে হবে। কিন্তু যা করতে হল তা স্কুলের মেয়েরাও পারবে।'

'হুম্। রোজ চারটের সময় ছাড়বে?'

'না বোধহয়। তুমি এসেছ বলে—।'

'আমি? আমার কথা বলেছ নাকি?'

'না না। বলেছি তুমি পৌঁছে দিয়েছ এবং প্রথম দিন বলেই আবার ফেরত নিয়ে যাবে। তাই মিস্টার সেন তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলেন।'

'মিস্টার সেনটা আবার কে?'

'ওর সেকসনেই আমাকে কাজ করতে হবে।'

'দেখো! প্রথম দিনেই যিনি সদয় হয়েছেন—!'

'এ্যাই! বাবার বয়সী ভদ্রলোককে নিয়ে রসিকতা করবে না।'

'বুঝলাম। এখন কোথায় যাবে বলো?'

'বাড়ি।'

'সেকী, এখনও রোদ রয়েছে। কলকাতা দেখবে না।'

'না। স্টেশনে চলো।'

'খিদে পায়নি? কিছু খেয়েছ?'

'টোস্ট খেয়েছি।'

ওরা কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে পা বাড়াল স্বর্ণেন্দু, 'এসো, আমার খিদে পেয়েছে।'

অগত্যা অবন্তীকেও ঢুকতে হল। বিরাট হলঘরে অনেক টেবিলচেয়ার পাতা। ডালপুরি আর আলুরদমের অর্ডার দিল স্বর্ণেন্দু।

'আমি দুটো খেতে পারব না।'

'কেন? দুটো টোস্ট খেয়ে তোমার পেট ভরে গেছে?'

'দুটো খাইনি, একটা।'

'কেন?'

চুপ করে রইল অবন্তী। স্বর্ণেন্দু মাথা নাড়ল।

দ্রুত প্লেট চলে এল। খেতে খেতে স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাল থেকে একা আসতে পারবে?'

'কী জানি!

'দ্যাখো, কাল আমি তোমার সঙ্গে আসতে পারি কিন্তু রোজ তো পারব না। আমি বলি কি বর্ধমান থেকে এভাবে আসা যাওয়া বেশিদিন করা সম্ভব নয়। তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। গাড়ি কোনও কারণে বন্ধ হয়ে গেলে বিপদে পড়বে। চাকরি যদি করতেই হয় তা হলে কলকাতায় কোনও হোস্টেলে তোমার থাকা উচিত।' স্বর্ণেন্দু বলল।

'কত খরচ হবে?'

স্বর্ণেন্দু হেসে ফেলল, 'তার আগের সমস্যা হল জায়গা পাওয়া। কলকাতায় মেয়েদের জন্যে যেসব হোস্টেল রয়েছে সেগুলো সব ভর্তি। একটা সিট খালি হলে অনেক দরখাস্ত পড়ে।'

'তা হলে?'

'আমি আজ সারাদিন ঘুরলাম। যে-কটা হোস্টেলে গিয়েছি একই কথা, জায়গা নেই।'

'দরকার নেই। আমি কাল থেকেই একা আসতে পারব।

'দ্যাখো—!'

দুটো ডালপুরি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল অবন্তীর। বলল, 'আমি তো আর বাচ্চা মেয়ে নই যে হারিয়ে যাব?'

সে রাতে বাড়ি ফিরে মনে হল আর দাঁড়াতে পারছে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা বিছনায় শরীর এলিয়ে দিল। মা কাছে এসে বসল, 'কীরে কী হল?'

'কী আবার হবে? আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'খাবি না?'

'পরে খাব।'

'আরে, এখন তো নটা। তোর ছুটি হয়েছে পাঁচটায়, এতক্ষণ লাগল?'

অবন্তী চোখ মেলল। তারপর উঠে বসল, 'কতক্ষণ লাগতে পারে জানো?'

'কতক্ষণ আর। বড় জোর আড়াই ঘন্টা।'

'অফিস থেকে স্টেশনে যেতে সময় লাগবে না?'

'শুনলাম তোর অফিস থেকে মিনিট কুড়ির মধ্যে স্টেশনে পৌঁছানো যায়। তা হলে তোর তো আটটা কি সওয়া আটটার মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া উচিত।' মা বলল।

'এসব কে বলল?'

'বাঃ এখান থেকে কেউ বুঝি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে না?'

'আমি অফিস থেকে হাওড়া স্টেশনে হেঁটে এসেছি। এত ভিড় ছিল যে একটা ট্রেন ছাড়তে হয়েছে।'

'হেঁটে এসেছিস কেন?'

'অমন ভিড়ে বাসে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'স্বর্ণেন্দু সঙ্গে ছিল?'

'ও না থাকলে রাস্তা চিনতাম কী করে?'

'ভালোই হয়েছে। প্রথম দিন রাস্তাঘাট চিনিয়ে দিয়েছে। কাল থেকে নিশ্চয়ই একাই যেতে পারবি?'

'বলেছি তো পারব। ও অবশ্য কালও পৌঁছে দিতে চেয়েছিল।'

'না-না। দেখে যখন এসেছিল তখন দরকার নেই।' মা গলা পালটাল, 'রোজ সঙ্গে গেলে কথা উঠবে।'

অবন্তী তাকাল।

মা বলল, 'স্কুল কামাই করে তোর সঙ্গে যাচ্ছে স্বার্থ ছাড়াই একথা কেউ বিশ্বাস করবে? নোংরা কথা বাতাসে উড়বে। ভালোই করেছিস একা যেতে পারবি বলে। নে, দুটো রুটি খেয়ে নে। কাল তো সেই সকালে উঠতে হবে, হ্যাঁরে, দুপুরে কী খেলি?'

'চা টোস্ট ডালপুরি আলুরদম।'

'বাব্বাও। না না, এত খরচ করার দরকার নেই। কাল তোকে রুটি আর আলুর চচ্চরি করে দেব। বাড়ির খাবার খেলে পেট ঠিক থাকবে। ও হ্যাঁ, যদি দেখিস বাসে ভিড় আছে তা হলে হেঁটেই যাওয়া আসা করিস স্টেশন থেকে। একটু না হয় আগে বের হবি। ভিড় বাসে নাকি কিছু লোক মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করে।' মা চলে গেল।

অবন্তী চুপচাপ শুয়ে রইল। হঠাৎ মায়ের কী হল? আজ সকালে স্বর্ণেন্দু যখন তাকে নিয়ে কলকাতায় গেল তখন মাকে খুব নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল। অথচ এখন একেবারে অন্য কথা বলল। স্বর্ণেন্দু জানতে পারলে কী বলবে? মাকে একদম বুঝতে পারছিল না অবন্তী। বাবা চলে যাওয়ার পর মা এবং স্বর্ণেন্দু ছাড়া তার পাশে কেউ নেই। মায়ের ক্ষমতা সীমিত, যা কিছু তা এই বাড়ির মধ্যে। স্বর্ণেন্দু তাকে বাইরের পৃথিবীতে আগলে রাখতে পারে। এতদিন বর্ধমানে থেকে যে জীবনে সে অভ্যস্ত হয়েছিল আজ কলকাতায় গিয়ে রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছে সে। যেন কুয়োর ব্যাঙ সাগরে পড়েছে। ওখানকার লোকজনদের সে জানে না। আজ অফিসে যাদের দেখল তারা কে কীরকম সেটা একদিনে বোঝা মুশকিল। মা বলল স্টেশন থেকে ডালহৌসি রোজ হেঁটে যাওয়া আসা করতে। অসম্ভব। আজ স্বর্ণেন্দু সঙ্গে ছিল বলে হাঁটতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কী ভিড়, হাঁটাই মুশকিল। দূরত্বটা অনেক, তার ওপর রাস্তাটাও খারাপ। মুশকিল হল সে সময় বাসের যে চেহারা সে দেখেছে তাতে ওঠার চেষ্টা করতেও সাহস হবে না তার।

রান্নাঘরে গিয়ে খাওয়ার সময় অবন্তী বলল, 'মা, আমি কী করে এখান থেকে অফিস করব ভেবে পাচ্ছি না।'

'কেন?'

'একদিনেই মনে হচ্ছে শরীরে কোনও শক্তি নেই।'

'প্রথম দিন বলে মনে হচ্ছে। এই যে আমি বিয়ের আগে কুটোটি নাড়িনি। বিয়ে হল এক মাস্টারের সঙ্গে যার ঝি-চাকর রাখার ক্ষমতা নেই। শাশুড়ি পাঁচটার সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে তুলে দিত। উনুন ধরাও, বাসি কাপড় কাচো, চা বানাও, রান্না চাপাও। তারপর স্কুলের ভাত দিয়ে ঘর ঝাঁট দাও, মোছ। তাতেও শেষ হয়নি। একগাদা ময়লা জামাকাপড় কাচতে হত স্নানের আগে। তারপর কোনওমতে নাকে মুখে গুঁজে শাশুড়ির পাশে বসে মহাভারত পড়ে শোনাতে হত। শরীর পারত না কিন্তু আমাকে পারতে হত। আস্তে আস্তে সেটাও অভ্যেস হয়ে গেল। অভ্যেস হয়ে গেলে আর কোনও অসুবিধা হয় না।' মা বলল।

পরের দিন স্টেশন পৌঁছে হাওড়ার রিটার্ন টিকিট কাটল অবন্তী। মাস শেষ হতে দেরি নেই। 'পয়লা তারিখ থেকে মান্থলি কেটে নেবে,' টিকিট নিয়ে এগোতেই দেখতে পেল স্বর্ণেন্দু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে যাত্রীদের ব্যস্ততার মধ্যে অদ্ভুত শান্ত একজন।

স্বর্ণেন্দু বলল, 'খুব দুঃখিত। তোমার বাড়িতে যেতে পারলাম না। দেরি হয়ে গেছে দেখে এখানে অপেক্ষা করছি।'

'কেন?'

'বাঃ, তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না?'

'তোমার স্কুল?'

'ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

'আজ আমি একা যাই?'

'একা?'

'বাঃ, তুমি তো রোজ কামাই করে পৌঁছে দেবে না! আজ আমি নিজেই চেষ্টা করে দেখি।'

'মাত্র একদিন গিয়েছ। পারবে?'

'দেখি না।'

'ঠিক আছে দ্যাখো। শোনো, হাওয়া স্টেশনে নেমে কাল যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম সেই পথে গিয়ে বাসের বদলে ট্রামে উঠবে। বলবে টেলিফোন ভবন। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'তুমি বোধহয় পাঁচটার ট্রেন ধরতে পারবে না। প্রথম দিন বলে আগে ছুটি দিয়েছিল। ফেরার সময় বাসে উঠতে পারবে না। ওই টেলিফোন ভবনের কাছে এসে হাওড়ার ট্রামে উঠবে। যাও, দেরি কোরো না। ভালোভাবে যাও।'

সেই দিনটার কথা মনে এলে এখন হাসি পায়। ট্রেনে উঠে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যদি ভুল হয়ে যায়। সহযাত্রীরা তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন? কারও কি বদ মতলব আছে? এই ট্রেনটা যেখানে একেবারে থেমে যাবে সেখানেই নামতে হবে। জড়সড় হয়ে বসে থাকতে থাকতে স্টেশনটা এসে গেল। চিমনি থেকে ধোঁয়ার মতো মানুষগুলোর সঙ্গে সে যখন স্টেশনের বাইরে এগিয়ে যাচ্ছে তখন শুনতে পেল, 'আপনি এই লাইনে থাকেন?'

অবন্তী মুখ ফেরাল না। প্রশ্নটা নিশ্চয়ই কেউ তাকে করবে না। এইসময় লোকটা পাশে এল, 'আপনি তো কাল জয়েন করলেন?'

এবার তাকাতে হল। সাধারণ চেহারার একজন মানুষ প্রশ্ন করছে।

সে হাঁটতে হাঁটতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। কলকাতার রাস্তাঘাটে গায়ে পড়ে যারা কথা বলে তাদের বেশিরভাগই মতলববাজ।

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'কেন? আপনার কী দরকার?'

'ওহো, আপনি ভুল বুঝছেন। একসঙ্গে চাকরি করি বলেই জিজ্ঞাসা করছি।'

অবন্তী হোঁচট খেল। সহকর্মীর সঙ্গে এভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

লোকটি বলল, 'ট্রামে উঠলে লেট হয়ে যাবে। শাটল বাসে আসুন।' অবন্তী দেখল লোকটা দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাসে উঠছে। এই বাস কোথায় যায়? অবন্তী এগিয়ে গিয়ে কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, 'টেলিফোন ভবনে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

অবন্তী উঠতেই লোকটা বলল, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না? না হওয়ারই কথা। আগে দ্যাখেননি তো। দুটো ডালহৌসি।'

বসার জায়গা পায়নি অবন্তী। লেডিস সিটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কন্ডাক্টর লোকটাকে টিকিট দিতেই সে বলল, 'আপনার টিকিট হয়ে গেছে।'

তখন আরও গাদা গাদা লোক বাসে উঠছে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। তার টিকিট লোকটা কেন কাটবে? কিন্তু এখন সে কী করতে পারে! আর একটা টিকিট কাটার কোনও যৌক্তিকতা নেই। পরে লোকটাকে দাম ফিরিয়ে দিতে হবে।

ডালহৌসিতে হুড়মুড়িয়ে অফিসযাত্রীরা নেমে গেল। অবন্তী নামতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে লোকটি বলে উঠল, 'আরে, এখানে নামছেন কেন? আরও দুটো স্টপ। এটা তো টিবোর্ড।'

বাস থেকে নেমে টেলিফোন ভবন চিনতে পারল অবন্তী। লোকটা পাশে পাশে হাঁটছে, অবন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমার টিকিট কাটলে কেন?'

'চেনা লোক, কেটে ফেললাম। এক অফিসে যাচ্ছি। পরের দিন দেখা হলে আপনি আমরটা কাটবেন।'

'কত দাম?'

'দূর। আপনি তো আচ্ছা লোক! সামান্য কটা পয়সার জন্যে ঝামেলা করছেন। বললাম তো কন্ডাক্টারের হাতে আমার ভাড়া দিয়ে শোধ করে দেবেন।'

ওরা অফিসে ঢুকল। অবন্তী তার চেয়ারে বসে লোকটাকে দেখতে পেল না। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে না মুছতে মিস্টার সেন এলেন, 'বাঃ, আমি ভবানীপুর থেকে আসছি, তুমি বর্ধমান থেকে আমার আগে চলে এসেছ। গুড।'

তখনই লোকটি এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে, 'সেনদা, এই মহিলা ডেঞ্জারাস মানুষ। আর একটু হলে মার খেয়ে যেতাম।'

'কী রকম?' মিস্টার সেন চেয়ারে বসলেন।

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল লোকটা।

'খুব অন্যায় করেছ বললাম। তুমি গুণ্ডা না সহকর্মী ও কী করে বুঝবে?'

'বাঃ, আমাকে দেখে কি গুণ্ডা বলে মনে হয়?'

'না। কিন্তু গুণ্ডাদের চেহারা তোমার মতো হয় কিনা তা তো ও জানে না।' মিস্টার সেন অবন্তীর দিকে তাকালেন, 'এ হলো বললাম, ভাল ছেলে, একটু বেশি কথা বলে।'

'আমি এখন বেশি কথা বলতে আসিনি। কাল অ্যাটেন্ডেন্স খাতায় উনি সই করেননি। আজও সোজা এখানে এসে বসেছেন। এমন করলে তো চাকরি থাকবে না। ওঁকে বললে উনি সন্দেহ করবেন। আপনি বুঝিয়ে দিন।' বলরাম ফিরে গেল।

মিস্টার সেন বললেন, 'রোজ অফিসে এসে অ্যাটেন্ডেন্স খাতায় সই করবে। দেরি করে এলে একটা লাল দাগ দেখতে পাবে। তিনটে লাল দাগের ওপর সই করলে একটা ক্যাজুয়াল লিভ কাটা যাবে। বলরাম এস্টাব্লিশমেন্ট কাজ করে। যাও সই করে এসো।'

অফিসের পরিবেশ খারাপ নয়। কিন্তু মেয়েদের ক্যান্টিনে বেশিক্ষণ বসা যায় না। এই অফিসে যে সব মহিলা চাকরি করেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বয়স হয়েছে। সবাই সংসার ফেলে অফিসে আসেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছেলেমেয়ে এবং স্বামী। প্রায় প্রত্যেকেই স্বামীর সমালোচনা করেন। সেইসব সমালোচনা শুনলে মনে প্রশ্ন আসবেই, কেন এঁরা স্বামীর সঙ্গে এক বাড়িতে আছেন। দ্বিতীয় বিষয় হল পুরুষ সহকর্মীদের সম্পর্কে মন্তব্য। কার চোখের দৃষ্টি খারাপ, কে মদ খায়, কে বাড়াবাড়ি রকমের ঘুষ নিচ্ছে ইত্যাদি। বর্ধমানে তাদের পাড়ায় কয়েকজন বিধবা বৃদ্ধার চাল চলনবলনের সঙ্গে এঁদের খুব মিল আছে।

দ্বিতীয় দিনে ওঁদের একজন কথা বললেন, 'তুমি শুনলাম বর্ধমান থেকে আস?'

'হ্যাঁ।'

'বাব্বা। এখন বয়স কম, দম আছে। মিস্টার সেন কী বলেন?'

'বুঝলাম না।'

'একটু সামলে সুমলে চলো। মফস্বলের মেয়ে তো, কলকাতার ব্যাটাছেলের মতলব বুঝতে পারবে না।'

'উনি আমার বাবার মতো।'

'হ্যাঁ। বাবা অনেকের ডাক নাম। কত দেখলাম।'

অবন্তীর শঙ্কা ছিল অফিস ফেরত স্টেশনে যাওয়ার পথে বলরাম তার সঙ্গ নেবে। কিন্তু লোকটাকে দেখতে পেল না। অনেকক্ষণ টেলিফোন ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার পরে 'লেডিস' বোর্ড ঝোলানো হাওড়ার ট্রাম দেখতে পেল সে। মেয়েরা মহারানির মতো বসে আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরুষরা বাদুড়ঝোলা ঝুলছে। হাওড়া স্টেশনে চলে এল সে বেশ আরামে। স্টেশনে

ঢুকতেই বর্ধমানের ট্রেন পেয়ে গেল। সওয়া আটটায় স্টেশনে নেমেই দেখতে পেল স্বর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে।

'যাক, ফিরে এসেছ তা হলে?'

'আশ্চর্য! আমি কি বাচ্চা মেয়ে যে হারিয়ে যাব!'

'কোনও অসুবিধে হয়নি?'

'একটু ভয় ভয় করছিল। তারপর ঠিক হয়ে গিয়েছিল।'

'খাওয়া দাওয়া করেছ?'

'হ্যাঁ। মা টিফিন দিয়েছিল।'

'বিকেলে তো কিছু খাওনি!'

'এক কাপ চা খেলে হয়। নাঃ, দেরি হয়ে গেছে।'

'ইচ্ছে যখন হয়েছে তখন খেয়ে যাও। রিকশা নিয়ো।'

'না। তার চেয়ে হাঁটতে ভালো লাগবে।'

ওরা হাঁটতে লাগল। স্টেশন চত্বর পার হতেই রাস্তা ফাঁকা।

স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'যাতায়াত করতে কষ্ট লাগছে না?'

'একটু। খুব টায়ার্ড লাগে। ঘুম পেয়ে যায়।'

'তোমার জন্যে একটা হোস্টেল জোগাড় করতেই হবে।'

'না।'

'কেন? খরচ বাড়বে বলে? আরে খরচের চেয়ে শরীরের কথা ভাব!'

'না। তার চেয়েও একটা বড় ব্যাপার আছে। হোস্টেলে থাকলে তোমাকে রোজ দেখতে পাব না।' অবন্তী মুখ ফেরাল।

'আহা। দেখতে হলে বেঁচে থাকতে হবে সুস্থ শরীরে। তুমি প্রতি শুক্রবার চলে আসবে, সোমবার সকালে ফিরে যাবে। মাঝে মধ্যে আমিও যাব কলকাতা। অফিস ছুটির পর দেখা করবে।'

'তুমি যাবে না।'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি?'

'না। এখন সত্যি কথা বলছ। পরে কাজের চাপে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারবে না। জান, আজ অফিসে কী শুনলাম?'

অবন্তী মহিলাদের গল্পটা বলল। স্বর্ণেন্দু হাসল, 'মানুষ যখন দ্যাখে তার জীবনের ভালো সময়টা সে উপভোগ করতে পারেনি তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে। আর তখনই সে এমন মন্তব্য করে। কারও ভালো দেখতে ইচ্ছে করে না। ওসব গল্প যত না শুনতে পার তত মঙ্গল।'

পাড়ার কাছাকাছি চলে আসতেই অবন্তী দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, এবার তুমি যাও।'

'কেন?'

'মায়ের ভয় তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে প্রতিবেশীরা গল্প ছড়াবে।'

'গল্প বলছ কেন? যা সত্যি তাই বলবে।'

অবন্তীর মুখে রক্ত জমল, 'সত্যিটা তো সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাবে না। তুমি রাগ কোরো না।'

খুব খারাপ লাগছিল স্বর্ণেন্দুকে ওভাবে বলতে। কিন্তু এখনই মায়ের সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া স্বর্ণেন্দু স্কুলে পড়ায়। এই গল্প খুব দ্রুত ডালপালা মেলবেই। স্কুলের শিক্ষকের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠবে সেক্ষেত্রে। এখন একটু আধটু আড়াল আবডাল থাকা ভালো।

বাড়িতে ঢোকা মাত্র মায়ের প্রশ্ন, 'এত রাত হল?'

মাথা গরম হয়ে গেল অবন্তীর। তবু নিজেকে সংযত করল সে। বলল, 'একদিন তুমি আমার সঙ্গে গেলে বুঝতে পারবে কেন রাত হল!'

'এখন কিছু খাবি না, একেবারে রাতে খাবার খেয়ে নিবি?'

'একেবারে খাব।'

বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে কাপড় পাল্টে খাটে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল অবন্তী। মা বলল,

'অফিসে কি খুব খাটাচ্ছে?'

'না। যাতায়াত করতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'প্রথম প্রথম ওরকম লাগবে।'

'হুঁ।' চোখ বন্ধ করল অবন্তী আজ স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'কেন?' চোখ খুলল সে ।

'না, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।'

'আমি সকালে ট্রেন ধরে কলকাতায় গিয়েছি, এখন ফিরে এলাম। এর মধ্যে দেখা হওয়ার কথা মনে হল কেন তোমার?'

'বললাম তো এমনি মনে হল। ভালই হয়েছে দেখা না হয়ে। আজ তোর বাবার এক বন্ধু এসেছিলেন। একই স্কুলে পড়ান। বললেন গতকাল স্বর্ণেন্দু কাউকে না বলে ডুব মেরেছে বলে হেডমাস্টারমশাই বিরক্ত হয়েছেন। আমি অবশ্য বলিনি তোকে পৌছাতে কলকাতায় গিয়েছিল। 'মা বলল।

ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল অবন্তী। সেই সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ছোটাছুটির সঙ্গে টেনশন, মনে হচ্ছিল সমস্ত শরীরে ব্যথা পাক খাচ্ছে। হাওড়ায় নামার পর থেকে হাওড়া না ছাড়া পর্যন্ত কী হবে একটা আশঙ্কা মনে চেপে থাকে। বর্ধমান স্টেশনে স্বর্ণেন্দুকে দেখামাত্র সেটা চলে গিয়ে মন হালকা হয়ে গিয়েছিল। আবার বাড়িতে মায়ের কথা শোনামাত্র একটা চাপ শুরু হল। গতকাল থেকে মায়ের কথা শুনে কেবলই মনে হচ্ছে স্বর্ণেন্দুকে মা পছন্দ করছে না। গতরাতে এটা মনে হয়নি। ভেবেছিল, যে কোনও আইবুড়ো মেয়ের মা ওই ধরনেই কথা বলতে পারেন। কিন্তু আজ স্পষ্ট হয়ে গেল মা চাইছে সে স্বর্ণেন্দু এড়িয়ে চলে। কেন? মা তো সব জানে। হঠাৎ বাবার কথা মনে এল। যেদিন সে প্রথম বাবাকে স্বর্ণেন্দুর কথা বলেছিল সেদিন বাবা একটুও রাগ করেনি। বরং খুশি হয়েছিল শুনে। অবন্তী টের পাচ্ছিল না তার চোখের কোণ উপচে জল গড়িয়ে যাচ্ছে বালিশের দিকে।

মিস্টার সেন বললেন, 'স্ট্যাটিসটিকটা ভাল করে বুঝলে এই দপ্তরের কোনও কাজ করতে তোমার অসুবিধে হবে না। আমাদের এই অফিসে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে তার রিপোর্ট একত্রিত করে আমাদের পাঠাতে হয় হেড অফিসে। সেখানে অন্যান্য অফিস থেকেও একই ধরনের রিপোর্ট যায়। তারা সব যোগ করে দিল্লিকে জানিয়ে দেয়। লোকসভায় কেউ প্রশ্ন করলে মন্ত্রী আমাদের পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতে জবাব দেন। অতএব বুঝতেই পারছ!' মিস্টার সেন থামলেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু না।' মাথা নিচু করল অবন্তী।

'মিথ্যে কথা আমি পছন্দ করি না হে!'

'না, মানে, আজ আসতে খুব কষ্ট হয়েছে।'

'কী রকম?'

'ট্রেনে বসার জায়গা পাইনি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ভিড়ের চাপ সহ্য করতে হয়েছে। হাওড়ায় এসে শাটল বাস পাইনি। বাসে কী ভিড়! দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল!'

'এগুলো নিত্যকার ব্যাপার। নতুন কোনও ঘটনা নয়। তোমাকে যখন সরকার চাকরি দিয়েছে তখন বাসট্রামের ভিড়ের জন্যে ঠিক সময়ে আসতে পারব না, বলোনি কলকাতা শহরের হাউসরেন্ট নিয়ে বর্ধমান থেকে আসব। চাকরি নেওয়ার সময় সবাই মাথা নিচু করে রাজি হয়, পরে অজুহাত তৈরি করে। কী করব বলুন, ছেলেটার জ্বর আসতে দেরি হল। আরে, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে আসতে? ছুটি নিলে না কেন? না, বাসে উঠতে পারছিলাম না, প্রচণ্ড ভিড়। দশটায় অফিস, তুমি বাড়ির সব কাজ সেরে দশটায় বেরিয়ে বাসে ভিড় দেখলে। তোমার তো উচিত ছিল দশটায় অফিসে পৌছাবার জন্যে নটার সময় বাড়ি থেকে বের হওয়া। বললেই মুখ হাড়ি হবে। অথচ এই লোকই যখন দেখবে তার ঠিকে ঝি ছটার বদলে সাতটায় বাড়িতে ঢুকছে কাজের জন্যে তখন তাকে ফায়ার করবে। নিজে কী করে মনে রাখবে না।'

'আমি আপনাকে এসব বলতে চাইনি।' অবন্তী বলল।

'চাওনি কিন্তু ভেবেছ। তুমি কলকাতায় হোস্টেল খোঁজো।'

'আমার কোনও জানাশোনা নেই।'

'পেয়িং গেস্ট থাকবে?'

'কোথায় ?'

'তালতলায় এক ভদ্রমহিলা পেয়িং গেস্ট রাখেন। হোস্টেলের থেকে একটু বেশি পড়বে কিন্তু সেফ জায়গা।'

অবন্তীর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই মহিলার উক্তি যিনি মিস্টার সেন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বাবা কারও কারও ডাকনাম হয়। সে মাথা নাড়ল, 'আমার পক্ষে বেশি টাকা খরচ করা সম্ভব নয়।'

নতুন কাজ বুঝিয়ে দিলেন মিস্টার সেন। সেইটে নিয়ে এমন ডুবেছিল অবন্তী যে টিফিনের কথা খেয়াল করেনি।'

'কী ব্যাপার ? নতুন এসেই এত কাজ দেখাচ্ছ! এখানে কিন্তু কাজ দেখালে প্রমোশন হয় না।' হাসির শব্দে মুখ তুলল অবন্তী। সেই ভদ্রমহিলা টেবিলের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'এটা কিন্তু ভারী অন্যায় সেনদা। নতুন পেয়ে টিফিনের সময়েও কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।'

মিস্টার সেন মাথা নাড়লেন, 'আরে, তাই তো। আমারও খেয়াল ছিল না। যাও হে, টিফিন করে এসো!'

'আগে আপনাকে মাঝে মাঝে আমাদের সেকশনে যেতে দেখতাম। এখন নতুন ছাত্রী পেয়ে চেয়ার ছাড়ছেন না। এ বড় অন্যায় কথা!'

'কী যে বলো। কাজ জানা লোককে সরিয়ে দিয়েছে। পুরো লোড এখন আমার ওপরে। বসো, বসো।'

অবন্তী উঠে পড়ল। ব্যাগ নিয়ে ক্যান্টিনে চলে এসে দেখর একজন মহিলা বেঞ্চির ওপর টানটান হয়ে ঘুমোচ্ছেন। শোওয়ার ধরনে বোঝা যাচ্ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। টিফিনের কৌটা খুলল সে। রুটি আর আলুভাজা। খেতে খেতে মনে হল মিস্টার সেনকে বললে কেমন হয়! যে ভদ্রমহিলা ওইরকম অশ্লীল মন্তব্য করতে পারেন তিনি কী করে হেসে গলে গল্প করতে গেছেন! তারপরেই স্বর্ণেন্দুর কথা মনে এল। কী দরকার বলার। তার চেয়ে চুপচাপ দেখে যাওয়াই ভাল। সম্পর্ক ভাল না হোক, খারাপ করে কী পাওয়া যাবে!

হাওড়া স্টেশনে পৌছে হকচকিয়ে গেল অবন্তী। হাজার হাজার মানুষ হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন চলছে না। কোথায় যেন অবরোধ হয়েছে। মাইকে ঘন ঘন সে কথা জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে অবরোধ তুলে নিলেই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ভিড়ের চোটে প্ল্যাটফর্মের ধারেই পৌছাতে পারল না অবন্তী। তার খুব ভয় করছিল। যদি আজ ট্রেন না ছাড়ে? যদি ছাড়তে ছাড়তে অনেক রাত করে? আর ছাড়লেই তো সে ট্রেনে উঠতে পারবে না। ঠিক পাশেই কয়েকজন মহিলা পুরুষ কথা বলছিলেন। এরাও নিত্যযাত্রী। কয়েকমাস আগে এইরকম অবস্থা হয়েছিল। বাড়ি পৌছাতে রাত দুটো বেজে গিয়েছিল।

অবন্তী কুঁকড়ে গেল। এই জনজঙ্গলে তার পরিচিত কেউ নেই।

পাশের মহিলা বললেন,'ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে বাস ধরা ঢের ভাল। দশটার মধ্যে পৌছে যাব।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'বাসে উঠতে পারবেন ভেবেছেন?'

তৃতীয় জন বলল, 'ধর্মতলা থেকে যেসব বাস ছাড়ে সেগুলোতে ওঠা যাবে। সরকারি বাস, যেতে হলে ওতেই যাওয়া ভাল।'

চতুর্থজন জিজ্ঞাসা করল, 'ট্যাক্সি কত নেবে?'

প্রথমজন বলল, 'পাগল!'

দ্বিতীয় জন বলল, 'হাজার টাকা চাইবে।'

তৃতীয় জন বলল, 'বারগেইন করলে আটশোতে নামবে।'

চতুর্থজন বলল, 'এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে না থেকে পার হেড দুশো খরচ করা ঢের ভাল।'

এরা কত দূরে যাচ্ছে অবন্তী জানে না। কিন্তু তার ব্যাগে মাত্র কুড়িটা টাকা পড়ে আছে। তার

কান্না পাচ্ছিল।

'কী ফেঁসে গেছেন তো?' হঠাৎ ভিড় ফুড়ে বলরাম সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে হাসি।

'আপনি হাসছেন?'

কেঁদে কোনও লাভ নেই। বাড়ি যাবেন কী করে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কলকাতায় আত্মীয়স্বজন আছে?'

নীরবে মাথা নেড়ে না বলল অবন্তী।

'কেস গিলে হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকুন।'

'অন্য কোনওভাবে বর্ধমানে যাওয়া যায় না?'

'যাবেন ? বাস আছে কিন্তু খুব কষ্ট হবে। এক কাজ করি। ঝটপট শিয়ালদায় চলুন। এখন সাড়ে ছটা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাতে আছে। দার্জিলিং মেইল পেয়ে যাবেন। সাড়ে নটায় বর্ধমান। চলুন।'

অথৈ সমুদ্রে সবুজ দ্বীপ দেখতে পেল অবন্তী। শিয়ালদায় পৌঁছাল শেয়ার ট্যাক্সিতে উঠে। আজ সে আগ বাড়িয়ে ভাড়া দিল। পাঁচটা টাকা চলে গেল। বলরাম বলল, 'আর পনেরো মিনিট আছে। টিকিট করে নিন।'

'আমার তো রিটার্ন টিকিট করা আছে।'

'সেটা তো হাওড়া থেকে। লেডিস কাউন্টারে দাঁড়ান।'

শিয়ালদাতেও ভিড়। তবে হাওড়ার মতো নয় টিকিট কাটার পর হাতে ছিল মিনিট তিনেক। বলরাম এর মধ্যে খোঁজ নিয়েছে কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে দার্জিলিং মেইল ছাড়ে। তার গেট পর্যন্ত পৌঁছে বলল, 'দৌড় লাগান। যে কম্পার্টমেন্ট পাবেন উঠে পড়বেন।'

'আপনি যাবেন না?'

'আমার স্টেশনে এই ট্রেন যাবে না। আজ রাত্রে কলকাতায় থেকে যাব। আপনি আর কথা বাড়াবেন না। ছুটুন।'

অতএব ছুটল অবন্তী। গার্ডের কামরা পেরিয়ে যেটা সামনে দেখতে পেল সেটায় উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। ততক্ষণে হৃৎপিণ্ড গলার কাছে চলে এসেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। চলন্ত ট্রেনে দরজার সামনের প্যাসেজটা খালি। একটু সহজ হতে সে ভেতরে পা বাড়াল। এটা ফার্স্ট ক্লাস। একদিকে প্যাসেজ আর অন্যদিকে ক্যুপ। তার টিকিট অর্ডিনারি সেকেন্ড ক্লাসের। টি টি যদি টিকিট দেখতে চায় তা হলে জেলে যেতে হবে অথবা ফাইন দেবার টাকা তার কাছে নেই।

এইসময় একটা ক্যুপ থেকে কালো কোট পরা টি টি বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই লোকটা হাসল, 'যাক্ বাবা, এসে গেছেন। খুব বেইজ্জত হয়ে যেতাম। ভাবছিলাম জগন্নাথ তো কখনও কথার খেলাপ করে না। থার্ড ক্যুপেতে চলে যান।'

'তার মানে?'

লোকটা চোখ ছোট করল, 'আপনাকে জগন্নাথ পাঠায়নি?'

'না। ওই নামের কাউকে আমি চিনি না।'

'আপনি কী করেন?'

'আমি কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে চাকরি করি। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখলাম ট্রেন বন্ধ। অবরোধ হয়েছে। আমার বর্ধমানে বাড়ি। তাই শিয়ালদায় এসে দার্জিলিং মেল ধরেছি। এটা যে ফার্স্টক্লাস তা বুঝতে পারিনি। অবশ্য তখন ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছিল।'

'বেশ করেছেন।' লোকটা চোখ ছোট করে হাসল, 'একটু দাঁড়ান।'

অবন্তী দেখল যে ক্যুপে থেকে লোকটা বেরিয়েছিল আবার সেই ক্যুপেতে ফিরে গেল। ছুটন্ত ট্রেনে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল। কাচের শব্দ কানে আসতেই দেখল অল্পবয়সী একটা ছেলে ট্রের ওপর গ্লাস এবং সোডার বোতল চাপিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে, 'দিদি সরে যান, এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে।'

সিটকে সরে গেল অবন্তী, ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে ওই একই ক্যুপেতে ঢুকল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খালি ট্রে নিয়ে ফিরে এল ছেলেটা। একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি কি

লাইনে নতুন?'

'তার মানে?'

'শিয়ালদা বর্ধমান ট্রিপ মারে যেসব দিদিরা তাদের আমি চিনি। কখনও আপনাকে দেখিনি তো তাই জিজ্ঞাস করলাম।'

'ভাই আমার বাড়ি বর্ধমানে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করি তোমাদের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মাইরি বলছেন?'

'সত্যি।'

ছেলেটা চট করে পেছনে তাকাল। তারপর বলল, 'ঝটপট বাথরুমে গিয়ে ছিটকিনি আটকে বসে থাকুন।'

'কেন?' প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল অবন্তী।'

'ট্রিপ মারা এক দিদির আসার কথা ছিল, আসেনি। টিটিবাবু ক্লায়েন্টকে বোঝাচ্ছে আপনাকে বুদ্ধি করে ম্যানেজ করে নিতে। আসুন।' ছেলেটা ইশারায় তাকে ডেকে নিয়ে এল একটা টয়লেটের কাছে। এবং তখনই ট্রেনটার গতি কমে এল। ছেলেটা বলল, 'দক্ষিণেশ্বর আসছে, তারপর বর্ধমান। এখানে নেমে যেতে পারেন কিন্তু আর ট্রেন পাবেন না। বরং বাথরুমে ঢুকে পড়ুন। বাঁ দিকেরটার দরজা শক্ত আছে।'

ছেলেটা সরে যেতেই ট্রেন থামল। দূর থেকে গলা পেল অবন্তী, 'আসুন, আপনার বসার জায়গা করে দিয়েছি।' সে তাকিয়ে দেখল কালো কোট পরা লোকটা হাত নাড়ছে। ট্রেন দাঁড়াল। কেউ উঠল না। অবন্তী দ্রুত টয়লেটে ঢুকে পড়ল। ছিটকিনি তুলে দিয়ে স্বস্তি হল না। দরজার ঘোরানো হাতলটা কীভাবে আটকে দেওয়া যায় তার জন্যে চারপাশে তাকাল। সদ্য ছাড়া ট্রেনে টয়লেট পরিষ্কার। হাতলটাকে আটকে রাখার জন্যে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। অবন্তী ব্যাগ খুলল। চিরুনিটা বের করে হাতল আর দরজার খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল অনেকটা জোর দিয়ে। ট্রেন চলছে। এই সময় দরজায় শব্দ হল। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অবন্তী। তারপরে মনে হল এই শব্দ অন্য কোনও যাত্রীও করতে পারে। কিন্তু আরও তো তিনটে টয়লেট রয়েছে। সেগুলো নিশ্চয়ই ভর্তি হয়ে যায়নি। এবার শব্দটা আরও জোরে হল। ছুটন্ত ট্রেনের চাকার আওয়াজ ছাপিয়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। দরজাটা এবার থরথর কাপছে। পিঠ দিয়ে সেটা চেপে ধরল অবন্তী। এই ছোট্ট চার দেওয়ালের মধ্যে তার সমস্ত অস্তিত্ব, এর একটা দেওয়াল ভেঙে গেলেই শকুনের পাল ঝাপিয়ে পড়বে তার ওপরে। কিন্তু এই কামরায় কি অন্য কোনও যাত্রী নেই? প্রথম শ্রেণীতে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা অর্থবান। তাঁরা কি যে যার ক্যুপেতে চোখকান বন্ধ করে বসে আছেন। দড়াম দড়াম করে লাথি পড়ল দরজায়। কেঁপে উঠল সেটা। বাইরে থেকে নব ঘোরাবার চেষ্টা হচ্ছে। তার চাপে বেঁকে যাচ্ছে চিরুনিটা। শস্তার চিরুনি। এটাকে ফেলে দিয়ে নতুন কিনবে ভেবেছিল অবন্তী। বেঁকে গিয়ে চিরুনিটা আরও শক্ত হয়ে বসে গেছে হাতল আর দরজার দেওয়ালে।

অবন্তী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ধীরে ধীরে বসে পড়ল শুকনো মেঝের ওপর। শব্দ বন্ধ হয়েছে। দরজার ওপাশে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। থাকলেও ঘাপটি মেরে রয়েছে। অদ্ভুত অবসন্ন হয়ে পড়ে রইল অবন্তী। প্রচণ্ড জোরে দুলছে কম্পার্টমেন্ট। চাকার শব্দ এখন বড় কাছাকাছি। বর্ধমান স্টেশনে যদি দরজার বাইরে ওরা থাকে? চিৎকার করবে সে। লোকজন ডাকবে। স্বর্ণেন্দু যদি স্টেশনে থাকে! এই ট্রেন সাড়ে নটায় বর্ধমানে পৌঁছাবে। স্বর্ণেন্দু কি ততক্ষণ থাকবে?

একসময় খুব হুইসল দিতে লাগল ইঞ্জিন। তারপর গাড়ির গতি কমে এল। অবন্তী টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। জানলার খড়খড়ি দিয়ে দেখতে পেল বাইরের আলো সরে সরে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা দাঁড়িয়ে যেতেই হকারদের চিৎকার শুরু হল। এই চিৎকার তার চেনা। দরজা খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু বেঁকে যাওয়া চিরুনিটা কিছুতেই নড়ছে না। ছিটকিনি খুলল অবন্তী অথচ দরজার নব ঘুরছে না। যদি সে দরজা খুলতে না পারে তা হলে এই ট্রেন তাকে নিয়ে চলে যাবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে নবটাকে ঘোরাতে চাইল। তাতে চিরুনিটা আরও একটু বেঁকে জড়িয়ে গেল। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অবন্তী।

মানুষজনের কথা শোনা যাচ্ছে। অথচ ওরা কেউ টের পাচ্ছেন না সে আটকে আছে টয়লেটের ভেতরে। অবন্তী জানলার ফোকরের দিকে তাকাল। ওখানে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করবে? প্রচণ্ড হতাশায় সে দরজায় ধাক্কা মারল। এর আগে দরজাটা চাপ খেয়েছিল বাইরে থেকে। এবার ভেতর দিক দিয়ে চাপ আসায় চিরুনিটা আলগা হয়ে গেল। চুলের ক্লিপ বের করে টানতেই সেটা খুলে এল। হাতল ঘোরাতেই দরজা খোলা। সামনেই এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন টয়লেটে ঢোকার জন্যে। হেসে বললেন, 'দরজাটা আটকে যায় বুঝি?'

কোনও জবাব না দিয়ে দ্রুত প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল সে।' কোনওদিকে না তাকিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। গেটে দাঁড়ানো চেকার যে হাত বাড়িয়েছে টিকিটের জন্যে সেটাও তার নজরে পড়ল না। একবারে ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো বাইরে বেরিয়ে আসতেই সামনে একটা মানুষকে দেখে চোখ তুলল সে। একটু একটু করে দৃষ্টি ফিরে পেল যেন, স্বর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে।

সে ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলল, 'আমি আর পারছি না।'

স্বর্ণেন্দু ওর হাত ধরল। কয়েক পা হেটে রিকশায় তুলল ওকে। রিকশা চলতে আরম্ভ করা মাত্রই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অবন্তী। সেই শব্দ রাতের প্রায় নির্জন হয়ে আসা রাস্তার দু-একজন লোকের কানে যেতেই তারা মুখ ফিরিয়ে তাকাল অবাক হয়ে। স্বর্ণেন্দু নিচু গলায় বলল, 'খুব কষ্ট হয়েছে, না?'

মিনিট খানেক চুপচাপ কাঁদল অবন্তী। তারপর আঁচলে মুখচোখ মুছল। স্বর্ণেন্দু বলল, 'এখন পর্যন্ত হাওরার ট্রেন আসেনি। কিন্তু আমি ভাবছি বুদ্ধি করে তুমি দার্জিলিং মেলে এলে কি করে? অবশ্য না এলে হয়তো সারারাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হতো তোমাকে। আমি যে হাওড়ায় যাব তার কোন উপায় ছিল্ না।'

'কেন যাব?'

'মানে? তুমি কলকাতার কিছু চেন না, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আর তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন যাব?'

'তুমি তো দেখলে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারলে না। যখন আমাকে সবসময় বাঁচাতে পারবে না তখন মুখে বলে কি লাভ!'

'বাঁচানোর কথা উঠছে কেন? হাওড়া স্টেশনে নিশ্চয়ই হাজার হাজার যাত্রী আটকে আছেন, তাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা কম নয়।'

'আমি দার্জিলিং মেলের যে ফার্স্টক্লাস কামরায় উঠেছিলাম সেটার একটা ক্যুপেতে মদের আসর ছিল। ওদের মেয়েমানুষের দরকার ছিল। ফার্স্টক্লাসের টিকিট না থাকায় আমি ওখানে উঠে অন্যায় করেছি। ওরা আমাকে নিয়ে ফুর্তি করতে চেয়েছিল। তুমি পারতে আমাকে বাঁচাতে?'

'আশ্চর্য? এটা কি জঙ্গলের জগৎ? কম্পার্টমেন্টে আর যাত্রী ছিল না?' উত্তর দিল না অবন্তী। দিতে ভাল লাগছিল না।

স্বর্ণেন্দু বলল, 'দ্যাখো , আমি তোমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলতে পারি না। কিন্তু এভাবে চাকরি করা সম্ভব নয়। বর্ধমানেই একটা কিছু খুঁজতে হবে।'

'বর্ধমান জায়গাটা খুব সেফ? মেয়েদের পক্ষে?'

'অন্তত এরকম ঘটনা ঘটে না। বিয়ের পর-।' স্বর্ণেন্দু থেমে গেল।

'এমন করে বলছ যেন বিবাহিত মেয়েদের কোনও ভয় নেই। পুরুষ মানুষেরা তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করে মাথায় তুলে রাখে। এই রিকসা দাঁড়াও।'

রিকশা দাঁড়াল। অবন্তী বলল, 'মাঝরাত্রে বাড়িতে অশান্তি হলে আমি মরে যাব। মাকে খবরটা দেবার জন্য পাড়ার কেউ না কেউ মুখিয়ে থাকবে।'

স্বর্ণেন্দু নেমে গেল। রিকশা চলতে শুরু করল। অবন্তীর খুব কষ্ট হল। যে মানুষটা তার জন্য সারাটা সন্ধ্যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল তার সঙ্গে সে কিছুতেই সহজ ব্যবহার করতে পারল না। এমনকি লোকলজ্জার ভয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারল না। অথচ ট্রেনের টয়লেটে সে যখন ভয়ে কাঁপছিল তখন এইসব লোক তার লজ্জা ঢাকতে যায়নি, কখনও যাবে না। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কয়েক পা এগোতেই এক বৃদ্ধ জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন, 'কী ব্যাপার? রাত হল?'

'আপনি জানেন না?'

'না।'

'কাল জেনে নেবেন।'

জোরে পা ফেলে সে বাড়ির সামনে পৌছতেই মাকে দেখতে পেল। গালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওঃ শেষ পর্যন্ত আসতে পারলি?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ।' ভেতরে ঢুকল অবন্তী।

'সবাই বলছে ট্রেন বন্ধ। বুদ্ধি করে বাসে আসতে পারতিস। বাস তো চলে।' পেছন থেকে মা বলল।

কথা না বলে ঘরের মেঝেতে বসে হাঁটুতে মুখ রাখল অবন্তী । শরীরে আর এক ফোটাও শক্তি নেই। মা ঘরে ঢুকল, একা এলি?'

'সঙ্গে কাউকে দেখেছ?'

'না এত রাত্রে , তাই ভাবলাম-।'

'কী ভাবলে ?'

'ওই কথা বলছিস কেন?'

'গুণ্ডারা যদি তোমার মেয়ের ইজ্জত কেড়ে নিয়ে থাকে তাহলে তুমি কী করবে?' চিৎকার করে উঠল অবন্তী।

মায়ের মুখটা একবোরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, 'কী বলছিস তুই? কী হয়েছিল আজ? খুলে বল আমাকে!'

'কিছুই হয়নি। কিন্তু হতে পারত। অনেক অভিশাপ থাকে বলেই একটা মেয়েকে এতদূর থেকে ডেইলি পেসেঞ্জারি করতে হয়। কোনও নিরাপত্তা নেই, বিপদের সময় কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে না। যেসব মেয়েরা সংসার নিয়ে থাকে তারা কখনও এই সমস্যা বুঝতে পারবে না। যাও আমাকে একা থাকতে দাও?'

' মুখ হাত পা ধুবি না?'

'বললাম তো, একটু একা থাকতে দাও।'

সেই রাতে ঘুম আসতে চাইছিল না। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি, মনে অবসাদ তবু ঘুম ছিল না চোখে। অথচ অবন্তী কিছুই ভাবছিল না। কোন কিছু ভাবার মত শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সাদা চোখে সে অন্ধকার দেখে যাচ্ছিল। উঠে বসল এক সময়, সমস্ত শরীরে ব্যাথা। কেন হল? মনে পড়ল, দরজাটা খোলার জন্য সে বারংবার কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। আশ্চর্য ! একসময় দরজাটা বন্ধ রাখতে মরিয়া ছিল আবার সেটা খুলতেও একই ব্যাপার।

বিছানা ছেড়ে নেমে জানালায় এল অবন্তী। যখন কত রাত? সবাই কেমন ঘুমাচ্ছে। কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মুখটা মনে পড়ল। বাবা থাকলে আজ এই ঘটনা ঘটত না। কারণ তাকে চাকরি করতে হত না। কিন্তু যেদিন চাকরি করতে বাইরে যেত, বাবা থাকলেও তো একই ঘটনা ঘটতে পারত! মেয়েদের সঙ্গে একজন পুরুষ না থাকলে তারা যেন মাঠের ঘাস। গরু ছাগল ভেড়ারা আরাম করে খেয়ে যাবে। ওদের কলেজের একটি মেয়ের দিদি ডিভোর্স হওয়ার পরেও শাঁখা সিদুর পড়ে চাকরিতে যান। ওরা শুনে অবাক হয়েছিল। মেয়েটি বলেছিল, 'দিদি বলে ওগুলো নাকি দিদিকে রক্ষা করে।

কিন্তু ওই যে ট্রেনের কন্ট্রাকটর, অথবা ক্যুপের ভেতর প্রতিক্ষায় বসে থাকা পুরুষটা ওরা কারা? এদের বাড়িতে মা বোন মেয়ে নেই? এরা কি সবাই পৃথিবীতে একা? হতেই পারে না। অথচ যে মেয়েটির আসার কথা ছিল বর্ধমান পর্যন্ত ট্রিপ দিতে তার পরিচয় কী? নিশ্চয়ই সস্তার কোনও পতিতা নয়। তা হলে কন্ট্রাকটর তার সঙ্গে এমন সমীহ করে কথা বলত না। মেয়েটি কি বর্ধমানের ? ওই ট্রেনের বাণিজ্য করে ফিরে আসে বাড়িতে? যে জীবন তার অজানা ছিল সেই জীবন এরা যাপন করে।

এই সময় স্বর্ণেন্দুর মুখ মনে পড়ে অবন্তীর। কোনোদিন যে গলায় সে ওর সঙ্গে কথা বলেনি আজ কেন বলল? কেন ওকে আঘাত দিল সে? ওর তো কোনও দোষ ছিল না । খুব খারাপ লাগছিল এখন। আর এই অনুভূতি প্রবল হওয়ামাত্র ঘুম পেয়ে গেল অবন্তীর।

স্টেশনে পৌছে স্বর্ণেন্দুকে দেখতে পেল না সে। টিকিট কেটে চারপাশে তাকাল। এখনই হাওড়া লোকাল ছেড়ে যাবে, অপেক্ষা করার উপায় নেই। অবন্তী দৌড়াল। অবরোধের পরদিন ট্রেন খুব মসৃনভাবে চলে। বসার জায়গাও পাওয়া গেল। আজ যাত্রীরা গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা বলাবলি করছে। প্রথম ট্রেন চলছে রাত সাড়ে ৯ টায়। এক ভদ্রলোক বললেন, "কাল বাড়ি পৌছলাম আড়াইটার সময়। ক্যাশের চাবি না নিয়ে এলে কোন শালা অফিস যেত।"

রাত আড়াইটে। সে যদি আড়াইটের সময় ফিরত তা হলে স্বর্ণেন্দু কি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত? অবন্তীর মন বলল থাকত। কিন্তু আজ এল না কেন? গতরাতে তার কথা শুনে কি খুব আহত হয়েছে। কাল রাতে সে ওই সময় যা বলেছিল তা তার মনের কথা নয় এটুকু যে বুঝতে পারে না সে কেন সাহিত্য পড়ে ? অবন্তী মুখ ফিরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

অফিস পৌছে চেয়ারে বসতে না বসতেই বলরাম চলে এল, 'কী? কী রকম প্লান দিয়েছিলাম, বলুন!'

'ভাল।' ছোট্ট জবাব দিল অবন্তী।

মিস্টার সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীসের প্লান।'

'আর বলবেন না দাদা। হাওড়ার ট্রেন চলেনি অবরোধ থাকায়, আমার তো বাড়ি যাওয়া হল না। মিস চ্যাটার্যি তো আরও দূরে। সেই বর্ধমান। তাঁই ওকে নিয়ে গেলাম শিয়ালদায়। বললাম দার্জিলিং মেইলে উঠে পড়ুন, সাড়ে নটায় বর্ধমান পৌছে যাবেন।' বলরাম হাসল।

'খুব ভাল করেছ।'

বলরাম চলে গেলে অবন্তী বলল, 'আমার পক্ষে বর্ধমান থেকে যাতায়াত করা সম্ভব হবে না। আপনি যে পেয়িং গেস্ট-এর কথা বলছিলেন—।'

'ও হ্যাঁ। কাল কথা বলেছি। ওখানে দুরকম রেট। সকালে চা আর যে কোনও একবেলার খাবার। অথবা দুবেলায় চারটে মিল। একটা ঘর খালি আছে। কখন দেখতে যাবে?'

'কত টাকা চাইছে?'

'সেটা ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন না। বিয়ে থা করেননি তো, একটু খিটখিট টাইপের। বললেন, যে থাকবে তার সঙ্গে কথা বলব। এগুলো তো বেশিদিন পড়ে থাকে না। আজ কালের মধ্যেই যেয়ো।'

'ঠিকানাটা দিন। কাল শনিবার, ছুটি। কালই যাব।'

'ছুটির দিনে আসতে ভাল লাগবে'?'

'কী করব বলুন! অফিস ছুটির পর তালতলায় গিয়ে কথা বলে ট্রেন ধরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ট্রেনের যা অবস্থা।'

মিস্টার সেন একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলেন।

আটটা নাগাদ বর্ধমানে নেমে অবন্তী আশা করেছিল স্বর্ণেন্দুকে দেখতে পাবে। কিন্তু স্বর্ণেন্দু আসেনি। সারাদিন মনের মধ্যে যে চাপটা তিরতির করছিল সেটা বাড়ল। এখন রিকশায় চড়া বিলাসিতা তবু উঠে বসল সে। সোজা চলে এল স্বর্ণেন্দুর বাড়িতে। দরজা খুললেন স্বর্ণেন্দুর মা, 'ওমা, তুমি? এসো এসো। অফিস থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ।'

'ও। একটু জিরিয়ে নিয়ে হাতমুখ ধোও, চা করি।'

'না-না। ওসবের দরকার নেই। আমি বাড়িতে যাব এখনই।'

'কী হয়েছিল কাল? ফিরতে খুব কষ্ট হয়েছিল মা?'

'হ্যাঁ।' অবন্তী মুখ ঘোরাল। স্বর্ণেন্দুকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রৌঢ়া বললেন, 'এদিকে হয়েছে এক গেরো। আমার এক বোনের হার্টের অসুখ ছিল। ভোরে খবর এল সে মারা গিয়েছে। মাসতুতো বোন, অসেক দিন দেখিনি। সিউড়িতে থাকে। স্বর্ণকে যেতে হয়েছে। মাসতুতো বোন, অনেক দিন দেখিনি। সিউড়িতে থাকে। স্বর্ণকে যেতে হয়েছে। বলেছিল আজই ফিরে আসবে। আমি বললাম একদিনে অতটা ধকল নেওয়ার কী দরকার। কেন, কোনও দরকার আছে?' বুক থেকে চাপটা পলকেই চলে গেল। অবন্তী বলল, 'আমার পক্ষে এখান

থেকে কলকাতায় যাওয়া আসা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ ওখানে হোস্টেলে জায়গা পাওয়া খুব কঠিন। এক ভদ্রলোক সন্ধান দিয়েছেন, পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকা যায়। কাল আমাদের ছুটি, তাই ভেবেছিলাম কাল কলকাতায় গিয়ে দেখে আসব।'

'কখন যাবে?'

'দুপুরে। সাড়ে বারোটার ট্রেনে।'

'আমার মনে হয় স্বর্ণ তার আগে ফিরে আসবে। ও এলে বলব তোমার সঙ্গে যেতে।' প্রৌঢ়া একটু ভাবলেন, 'ঠিকই করেছ। এভাবে রোজ যাতায়াত করলে শরীর ভেঙ্গে পড়বে। তবে বর্ধমানে যদি চাকরি পেতে তা হলে বেশি ভাল হত।'

'আমাকে কে চাকরি দেবে বলুন?'

'তোমাদের অফিসের কোন শাখাও এখানে নেই।'

'আমি ঠিক জানি না।'

'খোঁজ নাও না। আর চাকরি কেন পাবে না? এই যে চাকরি করছ তা কি কেউ তোমাকে দয়া করে দিয়েছে ? দেয়নি। চেষ্টা করলে ঠিক পেয়ে যাবে এখানে। তা হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' প্রৌঢ়া বললেন, 'যাও, আর দেরি করো না। তোমার মা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন। আমি স্বর্ণকে বলে দেব।'

স্টেশনে এসে অবন্তী দেখল স্বর্ণন্দু দাঁড়িয়ে আছে।

'কখন ফিরলে?'

'কাল রাত্রেই ফিরেছি। কেমন আছ?'

'ভাল। স্কুলে যাওনি?'

'না। স্কুলে জানে আমি মাসির মৃত্যুর খবর পেয়ে সিউড়িতে গিয়েছি।'

'এখন কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'কী করা আর যাবে। একটু অজুহাত খাঁড়া করতে হবে।'

'শোনো, আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক এই ঠিকানাটা দিয়েছেন।' ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে স্বর্ণেন্দুকে দিল অবন্তী ,'এই মহিলা কয়েকজন পেয়িং গেস্ট রাখেন। খুব নিরাপদ জায়গা। তাই দেখতে যাচ্ছি।'

'আমাকে যেতে হবে।।'

'বাঃ। আমি একা দেখে কিছু বুঝতে পারব?'

'ভদ্রলোক যখন রেফার করেছেন তখন নিশ্চয়ই ভালই হবে।

'তুমি আমার কথায় রাগ করেছ?'

'কোন কথায়?'

'সেই রাতে আমার মাথা ঠিক ছিলনা। আড়াই ঘণ্টা ছোট্ট টয়লেটের মেঝেতে বসে ভয়ে কেঁপেছি। নিজের ওপর এত রাগ হচ্ছিল যে সেদিন তোমাকে নির্বোধের মতো যা তা বলেছি। আই এম সরি।' অকপটে বলল অবন্তী। স্বর্ণেন্দু হাসল, 'ঠিক আছে চলো।'

স্বর্ণেন্দু টিকিট কাটল। এখন ট্রেন ফাঁকা। পাশাপাশি বসে স্বর্ণেন্দু বলল, 'দুপুরে না বেরিয়ে আরও আগে বের হলে হত।'

'কেন?'

'একটা সিনেমা দেখতাম। সত্যজিৎ রায়ের।'

'সত্যি? তোমার সঙ্গে কখনও সিনেমা দেখিনি।'

'কেন? 'মেঘে ঢাকা তারা'?'

'দুর। তোমার সঙ্গে দেখেছি নাকি? তুমি কোথায় বসেছিলে জানি না। আমার পাশে বসে বান্ধবী বকবক করছিল।'

'আচ্ছা, এই যে কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা কি তোমার মা জানেন?'

'না। কিছু বলিনি।'

'আজ কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞাসা করেননি ?'

'করেছে। বলেছি কাজ আছে। শুনে জিজ্ঞাসা করল, তোর অফিসে বুঝি ওভারটাইমের ব্যবস্থা আছে। বাঃ, খুব ভাল।'

'ওঁকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না।' স্বর্ণেন্দু বলল, অবন্তী তাকাল।

স্বর্ণেন্দু বলল, 'অভাবের থাবা যখন চেপে বসে তখন মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়।'

'তাই বলে আমার দিকে একবার তাকাবে না?'

'ওঁর মাথায় হয়তো সেটা ঢুকছে না।'

'কী জানি।'

'পরশুদিন খবর পেলাম শক্তিগড়ের একটা স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে শিক্ষিকা নেবে। গ্রাজুয়েট হলেই চলবে।'

'সে তো অল্প কয়েকদিনের জন্য।'

'হ্যাঁ, ধর মাস ছয়েক।'

'তারপর?'

'ছটা মাস সময় পাওয়া যাবে নতুন চাকরি খোঁজার।'

'শক্তিগড়ের চাকরিটা আমার হবেই?'

'চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'তারপর যদি কিছু না জোটে তাহলে কি হবে ভাবতে পারছ?'

'হ্যাঁ, ঝুকি থেকেই যাচ্ছে।' স্বর্ণেন্দুকে চিন্তিত দেখাল।

হাওড়া থেকে তালতলায় আসতে কোনও অসুবিধে নেই। ঠিকানাটা খুঁজে বের করল স্বর্ণেন্দু। একটু গলির মধ্যে বাড়িটা। তখন বিকেল সাড়ে চারটা। একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে ওরা অপেক্ষা করছিল।

যে ভদ্রমহিলা এলেন তার বয়স চল্লিশের মাঝামাঝি। লম্বা চওড়া পুরুষালি চেহারা। গায়ের রং ফর্সা হলেও কোনওমতে সুন্দর বলা চলে না । গলার স্বর বেশ ভারী, 'বলুন, কী ব্যাপার?'

অবন্তী বলল, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। মিষ্টার সেন আমাকে বলেছিলেন আপনি পেয়িং গেস্ট রাখেন—।'

'রাখি।' কথার মাঝখানে ছোট্ট করে বললেন মহিলা।

'সেই ব্যাপারেই এসেছি।'

'সেন আমাকে ফোন করেছিল। এখানে এত ডিমান্ড যে ঘর খালি রাখতে পারি না। বাড়ি কোথায়?'

'বর্ধমানে।'

'সেখান থেকে তো অনেক মেয়ে যাওয়া আসা করে। '

'আমি আর পারছি না।'

'বাড়িতে কে কে আছেন ?'

'মা আর ভাইরা।'

'ইনি কে?'

'আমাদের পারিবারিক বন্ধু। অভিভাবকের মতো।'

'ইনি ম্যারেড?'

'না।'

'হুঁ।'

'শোনো ভাই, তোমাকে তুমি করেই বলছি। আমার এখানে কতগুলো নিয়ম আছে যা থাকলে মানতে হবে। এ পাড়ায় আমাদের বাড়ির সুনাম আছে। মেয়েরা একা থাকলে যে দুর্নাম রটে তা এখানে আজ অবধি হয়নি। প্রথম কথা, রাত নটার মধ্যে ফিরতে হবে। স্পেশাল কেসে আগে থেকে বলতে হবে। অনাত্মীয় কাউকে এখানে এসে দেখা করতে বলবে না। ক্লোজ রিলেটিভ ছাড়া আর কেউ যেন এখানে ফোন না করে। তুমি ঘরে বসে সিগারেট খাও, কেউ দেখছে না, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মেড সার্ভেন্টকে দিয়ে সিগারেট কিনিয়ে আনা চলবে না। আর ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করলেই বেরিয়ে যেতে হবে। বুঝতে পেরেছ? এসো, ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

ভদ্রমহিলা উঠে ভেতরের দিকে পা বাড়াতে অবন্তী স্বর্ণেন্দুর দিকে তাকাল। স্বর্ণেন্দুর ঠোঁটে চাপা হাসি। সে ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করল। নীচে রান্না এবং খাবারের ঘর। ওপরে পাশাপাশি দুটো ঘরে চারটে বেড। সেগুলোতে কেউ নেই। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে পেয়িং গেষ্টরা থাকে। প্যাসেজের এ পাশের ঘরের দরজা খুলে ভদ্রমহিলা বললেন ,'এই ঘরটা পাবে। জানালা খুললেই হাওয়া। টয়লেট এই ফ্লোরেই। ঘরের ভেতর যে দরজাটা দেখছ ওটা আমার ঘরের। ওপাশ থেকেই বন্ধ থাকে। পছন্দ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'চলো নিচে যাই।'

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখন টাকা পয়সার কথা। এখানকার জিনিসপত্রের দাম নিশ্চয়ই জানা আছে। লোকে ভেবেছিল নকশালরা কমাতে পারবে উল্টো বেড়ে গেছে। কিন্তু আমার চার্জ খুব রিজেনেবল। যদি তুমি সকালে চা আর লাঞ্চ খেয়ে অফিসে যাও এবং রাত্র ডিনার বাইরে করে আস তা হলে তিনশো টাকা দিলেই হয়ে যাবে। আর যদি রাতেও খেতে চাও তা হলে চারশো।'

'মিষ্টার সেনগুপ্ত বলেছিলেন চারটে মিল পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ। ঠিকই। অফিস ফেরৎ চা আর পাঁপড় ভাঁজা পাবে।'

'দেখুন। আমি প্রথম চাকরিতে ঢুকেছি, টাকাটা—।'

'নো চান্স। আমি ওর ডাবল চাইলেও মেয়ে পাব। অবশ্য থাকতে থাকতে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ এলে পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে।'

অবন্তী উঠে দাঁড়াল, 'কবে জানাতে হবে?'

'আজই।'

'আজ?' ফাঁপরে পড়ল অবন্তী।

'একটু বাদে যিনি আসবেন তাঁকে তো ঝুলিয়ে রাখতে পারি না।'

'কিন্তু আমার যে কথা বলার দরকার?'

'কার সঙ্গে? এঁর সঙ্গে বলতে চান? বলুন।'

স্বর্ণেন্দু চাপচাপ শুনছিল। বলল, 'ঘর যদি পছন্দ হয়ে থাকে তা হলে তো আপত্তির কিছু নেই। উনি খুব বেশি চাইছেন না।'

ভদ্রমহিলা গম্ভীর মুখে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'কিন্তু আমি আজ টাকা নিয়ে আসিনি।' অবন্তী বলল।

'স্ট্রেঞ্জ। তুমি একদিন দোকানে গিয়ে জিনিস দেখে পছন্দ করে আসো এবং আর একদিন গিয়ে কেনো নাকি?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আসলে আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি। মাইনে পেতে দেরি আছে।'

'তা হলে তোমার উচিত ছিল মাইনে পাওয়ার পর খোঁজ খবর করা। আমার সময় নষ্ট করে কী লাভ হল?'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'দাঁড়ান, আর দিন আটেক আছে মাস শেষ হতে। আজ আমি আপনাকে দুশো দিয়ে যাচ্ছি, ও থাকবে এক তারিখ থেকে। তখন বাকিটা দিয়ে দেবে। এতে অসুবিধে আছে?'

'এই আটদিন আমি লস করব।' ভদ্রমহিলা হাসলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে অবন্তীকে সর্বাঙ্গে দেখলেন, 'ঠিক আছে, দিয়ে যান।'

স্বর্ণেন্দু টাকাটা বের করে টেবিলের ওপর রাখতেই ভদ্রমহিলা সেটা টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রসিদ কেটে দিলেন। আগাম বাবদ দুশো টাকা দেওয়া হল।

বেরুবার আগে ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি যদি এক তারিখে বাকি টাকাটা না দাও তা হলে আমার কোনও দায়িত্ব থাকছে না।'

বাইরে বেরিয়ে এসে অবন্তী বলল, 'তুমি ফট্ করে অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে?'

'দিতে তো হতই। এখন না দিলে জায়গাটা হাতছাড়া হয়ে যেত।'

'আমার কিন্তু মনে হল মহিলা চাপ দিয়ে টাকা নিলেন।'

'তা ঠিক। তবে ডিম্যান্ডও আছে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি এত টাকা এখানে প্রতিমাসে দিলে আমি বর্ধমানে কত দিতে পারব?'

'এছাড়া তোমার অফিস যাতায়াতের খরচ রয়েছে। অন্যান্য খরচগুলোর জন্যে রাখতে হবে।' স্বর্ণেন্দু বলল।

অবন্তী দাঁড়াল, 'থাক। চলো টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে আসি।'

'কেন?'

'নিজের জন্যে এত টাকা খরচ করলে মাকে যা দেব তা কম হয়ে যাবে।'

'বর্ধমান থেকে আসা যাওয়া ইত্যাদিতে তোমার তিনশো টাকা বেরিয়ে যাবে। তার ওপর শরীরের ওপর ধকলটার কথা ভাব।'

'সেটা সহ্য করব। তুমি শক্তিগড়ের চাকরিটা যাতে হয় তাই দ্যাখো।'

স্বর্ণেন্দু অবাক হল। কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

'কী হল?' অবন্তী জানতে চাইল।

'তুমি আগে নিজের মন ঠিক করো।' স্বর্ণেন্দু বলল।

'সত্যি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'যদ্দিন তুমি বিকল্প চাকরি না পাও তদ্দিন এই চাকরিটা তোমাকে করতে হবে। চাকরি না করলে সংসার চলবে না। তাই তো? বেশ, চাকরি করতে হলে সুস্থভাবে বাঁচতে হবে। বর্ধমান থেকে চাকরি করতে এলে সেটা সম্ভব নয়। অন্তত একটা মাস এখানে থেকে দ্যাখো।' স্বর্ণেন্দু বোঝাল।

'তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?'

'শনি রবিবার তো বর্ধমানে থাকছ তুমি।'

'বাকি পাঁচটা দিন হবে না?'

'বেশ, এর একটা দিন আমি আসব এখানে। চলো।'

ওর হেঁটেছিল। অনাদি কেবিনে মোগলাই পরোটা খেয়ে স্টেশনে গিয়েছিল। শনিবার বিকেলের ট্রেনে বসে অবন্তীর মনে হয়েছিল রোজ যদি এরকম ফাঁকা থাকত তা হলে সে কিছুতেই বর্ধমান ছেড়ে আসত না। মনে হচ্ছে সবার কাছে থেকে সে দূরে চলে যাচ্ছে।

'এক তারিখে তোমার মাইনে হবে?'

'জানি না। হলে এ মাসে তো পুরো পাব না।'

'তা হলে বাকি টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো।'

'নিতে পারি কারণ না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু পরে টাকাটা ফেরত নিতে হবে তোমাকে।'

'কেন?

'বাবা বলত টাকাপয়সা মানুষের সম্পর্ক খারাপ করে দেয়।'

শব্দ করে হেসে উঠেছিল স্বর্ণেন্দু।

বর্ধমান স্টেশনে নেমে অবন্তী বলল, 'জান, এত ভালভবে অনেকদিন বেড়াইনি আমি। বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে মনে হয়েছিল একথা। কিন্তু রাত না ফুরোতেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ভেবেছিলাম আমার জীবনে কোনও ভাললাগা থাকবে না।'

বাবার ছবিটা এতদিন টেবিলর ওপর ছিল, আজ দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে মা। হেমন্ত আর বসন্ত ছুটে এসে খবরটা দিল। যেন একটা বিশাল কাজ হয়েছে আজ বাড়িতে। হাতমুখ ধোয়ার পর দুই ভাই আবার কাছে এল। বসন্ত বলল, 'মা জিজ্ঞাসা করছে চা খাবি?'

অবন্তী মাথা নেড়ে না বলল। বসন্ত ছুটে গেল মাকে খবরটা পৌঁছে দিতে। হেমন্ত কাছে এল একা হতেই, 'এই দিদি একটা ফুলপ্যান্ট কিনে দিবি?'

'কেন? তুই তো হাফপ্যান্ট পরিস!'

'হুঁ। কিন্তু আমার বন্ধুদের সবাই ফুলপ্যান্ট কিনেছে। টেরিকটের।'

'ঠিক আছে। মাইনে পেলে মাকে বলব।'

'মা দেবেন না বলেছে।'

'মা না বললে আমি কী করে দেব?'

'তুই তো চাকরি করিস।'

ভাই-এর দিকে অবাক হয়ে তাকাল অবন্তী। তারপর হাসল, 'মাকে বুঝিয়ে বলব। মা তো আমাদের সবার থেকে বড়। ওঁর কথা শুনতে হবে।'

'কাজ হল?' মা ঘরে ঢুকল।

'কাজ?'

'ওভারটাইম করতে গিয়েছিলি তো? কত দেবে?'

'আমি ওভারটাইম করতে যাইনি।'

'কলকাতায় গিয়েছিলি তো?'

'তোমায় কে বলল?'

'কেউ বলেছে। ভগবান চোখ দিয়েছে, সেই চোখ দিয়ে যা দ্যাখে তা তুই আটকাবি কী করে? বাড়ি এসে বলে গেল তুই ছুটির দিনে কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিস।'

'বেড়াতে গিয়েছি?'

'না তো কী! নিশ্চয়ই সিনেমা দেখেছিস, রেস্টুরেন্টে খেয়েছিস। তাই বাড়ি ফিরে আমার হাতের চা মুখে রুচল না।' মা যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

অবন্তী কথাটা বলব বলব করেও বলতে পারল না। সে কলকাতায় গিয়ে থাকবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুনলেই মা কুরুক্ষেত্র বাধাবে। কথাটা বলতেই হবে তবে আজ রাতে নয়। তা হলে রাতের ঘুম নষ্ট হবে। কিন্তু সে কলকাতায় গিয়েছে এই খবর যদি কেউ মাকে দিয়ে যায় তা হলে অবশ্যই বলেছে স্বর্ণেন্দু সঙ্গে ছিল। স্বর্ণেন্দুকে সে না চিনলেও ওর চেহারার বর্ণনায় মায়ের বুঝতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু মা একবারও স্বর্ণেন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করল না। কেন? সে নিশ্চয়ই একা সিনেমা বা রেস্টুরেন্টে যায়নি। ওই কথাগুলো বলে কি মা বুঝিয়ে দিল স্বর্ণেন্দুর কথা তার জানা। অবন্তীর মনে হল মা যেন দিন দিন বেশি প্যাঁচানো হয়ে যাচ্ছে। এতদিন মনে যা আসত তাই বলে ফেলত। এখন—।

'এই দিদি, কী খেলি রে?'

চমকে তাকাল অবন্তী হেমন্তর দিকে। বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'মাংস?'

'তোদের মাংস খেতে ইচ্ছে করছে?'

'হ্যাঁ।' দুইভাই একসঙ্গে বলে উঠল।

'ঠিক আছে, কাল রবিবার মাকে বলব মাংস রাঁধতে।'

রাতের খাওয়া শেষ হলে মা বলল, 'তোকে একটা কথা বলব।'

'বলো।'

'যেদিন ট্রেন বন্ধ ছিল সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল, না?' মায়ের গলা এখন অনেক নরম। অবাক হল অবন্তী। সে জবাব দিল না। এই গলায় কথা বলছে কেন মা? অনেকদিন তো বলে না।

'আচ্ছা, তোর এখান থেকে যাতায়াত করতে তো প্রায় দশ টাকা খরচ হয়ে যায়। তার ওপর পরিশ্রম তো কম হয় না। আমি ভাবছিলাম যদি কলকাতায় শস্তায় থাকার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'কলকাতায় থাকব? হাঁ হয়ে গেল অবন্তী।

'খোঁজ নিয়ে দ্যাখ না যদি শস্তায় পাওয়া যায়। তোর অফিসের মেয়েরা তো খবর দিতে পারে। এখন একটু অসুবিধে হবে কিন্তু তোর মাইনে বাড়লে সেটা ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি তা হলে পুরো মাইনের টাকা তোমাকে দিতে পারব না।'

'সেই টাকা থেকে তোকে রোজ দশটাকা দিতে হবে। তাই না? তারপর হঠাৎ যদি অসুখ করে যায় ধকল সইতে না পেরে তখন?'

'তুমি বলছ যখন তখন খোঁজ করব। সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে মা। ফেরার সময় যেন রাস্তাটা শেষ হতেই চায় না। বেশিরভাগ দিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আসতে হয়। এটা হলে শুক্রবার রাত্রে আসব আবার সোমবার ফিরে যাব।' অবন্তী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

'প্রত্যেক শুক্রবারে আসার দরকার কী। আটবারের গাড়িভাড়া কি রকম? তা ছাড়া সাবা সপ্তাহের কাপড় জামা কাচাকাচি আছে না? তুই যে হপ্তায় মাইনে পাবি সেই হপ্তায় এসে টাকা দিয়ে

যাস।'

'মাসে একবার?'

'আর পরপর ছুটি পেলে আলাদা কথা। আমার সেই মাসতুতো বোনের ঠিকানাটা তোকে দিয়ে দেব। রবিবারে ওর বাড়িতে যাস। কেমন? শুয়ে পড়।' মা আলো নিভিয়ে দিল।

প্রথমে খুব আনন্দ হচ্ছিল। ভয় থেকে মুক্তির আনন্দ। সে কলকাতায় পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবে খবরটা শুনলেই মা খেপে লাল হয়ে যাবে বলে ভেবেছিল। পয়সা বাঁচাতে হাওড়া স্টেশন থেকে অফিসে হেঁটে যাওয়া আসা করতে যে উপদেশ দেয় সে কিছুতেই থাকা খাওয়ার জন্যে অত টাকা খরচ করে কলকাতায় থাকা বরদাস্ত করবে না। কিন্তু এ কী হল? মা এমন পাল্টে গেল কী করে?

অন্ধকার ঘরে শুয়ে ভাবছিল অবন্তী। প্রতি সপ্তাহে সে আসতে পারে না। ছুটির দিনেও কলকাতায় থাকতে হবে। বর্ধমানের এই বাড়িতে এলে যে স্বস্তি পাওয়া যায় সেটা হারিয়ে যাবে। এই বাড়ির প্রতিটি কোণে বাবার স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতি থেকে দূরে সরে যেতে হবে তাকে। মন ক্রমশ বিষণ্ন হল। সেই সূত্রে চলে এল স্বর্ণেন্দু। স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে রোজ তো দেখা হবেই না, শনি রবিবারও নয়। আজ কলকাতায় যাওয়ার সময় এবং ফেরার পথেও মনে হয়েছিল পাঁচটা দিন কষ্ট করে না দেখে থাকা যায়। স্বর্ণেন্দু কি শনি রবিবার কলকাতায় যাবে? হয়তো প্রথম প্রথম যাবে। কিন্তু ওর কাজকর্ম থাকে, তখন?

হঠাৎই মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। মা নিশ্চয়ই শুনেছে স্বর্ণেন্দু আজ তার সঙ্গে ছিল। এখানে থাকলে স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে তার রোজ দেখা হবে এটা আর মা মেনে নিতে পারছে না। সে কারণেই মা গরম গলায় তাকে কলকাতায় থাকার প্রস্তাবটা দিল। কলকাতায় থাকলে স্বর্ণেন্দু রোজ দেখা করতে পারবে না, দূরত্ব বাড়বে। হয়তো মা ভাবছে এইরকম চললে ওদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে বাতাস বেরিয়ে এল। হঠাৎ খুব কান্না পেল তার। মা কেন স্বর্ণেন্দুকে অপছন্দ করছে। স্বর্ণেন্দু খুব ভালমানুষ। এতদিন ধরে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা কিন্তু কখনও স্বর্ণেন্দু তার দিকে লোভের হাত বাড়ায়নি। স্কুলে থাকার সময় সে বান্ধবীদের কাছে শুনত নানান ঘটনা। ওদের মধ্যে যারা প্রেমে পড়ত তারা এসে গল্প করত। প্রেম পড়া মাত্রই ছেলেরা চায় চুমু খেতে, বুকে হাত বোলাতে। তা না হলে প্রেম কীসের? মজা লাগত শুনে। কলেজে পড়ার সময় এক স্কুলের বান্ধবীর পাঁচজনের সঙ্গে প্রেম করা হয়ে গিয়েছিল। তার দিকে তাকালেই অবন্তীর মনে হত একে পাঁচজন ছেলে চুমু খেয়েছে, পাঁচজন বুকে হাত রেখেছে, তখন গা গুলিয়ে উঠত। ঘেন্না লাগত। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। কিন্তু স্বর্ণেন্দু তার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করে এসেছে। কখনও নিজেকে খেলো করেনি। বরং তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ওকে কেন মা অপছন্দ করছে। মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

রবিবার সংসারের কাজেই কেটে গেল। পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে গেলেও সঙ্গে বিছানাপত্র নিয়ে যেতে হবে। অন্তত একটা পাতলা তোশক, চাদর, বালিশ। ভাগ্যি ভাল বাড়িতে একটা তোশক তোলা ছিল। এটা বাবার বিয়ের আগের তোশক। মেসে থাকতে হত বলে কিনেছিল। সিঙ্গল। বিয়ের পর ওটা আর কাজে লাগেনি বলে মা তুলে রেখেছিল। বাবার অল্প বয়সের স্মৃতি। মা বলল, 'ওটা আর বাড়িতে রেখে কী হবে। তুই নিয়ে যা।'

বালিশের ওয়াড়, চাদর কাচাকাচি করে নিতে হল। প্রথম মাসটা এই দিয়ে চালাতে হবে। পরে একটু একটু করে কিনে নিতে হবে। দুপুরবেলায় অবন্তীর খেয়াল হল, সে যে পেয়িং গেস্ট হিসেবে একটা জায়গা পেয়েছে তা এখনও মাকে বলেনি। অথচ মায়ের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তার যাওয়ার জায়গা ঠিক হয়ে গিয়েছে।

খাওয়াদাওয়ার পর মা বলেছিল, 'মাংসের গন্ধ আর সহ্য হয় না।'

সকালে ভাইদের ইচ্ছের কথা মাকে বলেছিল। মা খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'এই তো সবে মানুষটা গেল, এর মধ্যেই মাংস খাবি?'

অবন্তী বলেছিল. 'মাছ খেতে যদি পারি তা হলে মাংস কী দোষ করল। ওদের ইচ্ছে হয়েছে,

রোজ তো খায় না।'

'হাতের টাকা তো বেহিসাবির মতো খরচ করতে পারি না।'

'একদিন তো। তা ছাড়া আমি তো মাইনে পাব।'

অতএব মাংস এসেছিল। বাবার মৃত্যুর পর মা মাছ-মাংস-ডিম খাচ্ছে না। পেঁয়াজ আলাদা করা যাচ্ছে না বলেই হচ্ছে। অবন্তী লক্ষ করত রাত্রে রুটির সঙ্গে আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি মা করবেই। সেটা খাওয়ার সময় বলত, 'লোক শুনলে ছি ছি করবে।'

'আশ্চর্য! এখনকার বিধবারা এসব মানে না। মানা উচিত নয়।'

'পেঁয়াজটা খাচ্ছি, তাই বলে ওসব খেতে পারব না। আর বাইরের লোককে জানানোরই বা কী দরকার।'

সেই মা বলল, 'এবার থেকে তুই মাংস রাঁধিস।'

'আমি তো থাকছি না এখানে।'

'যখন থাকবি তখন রাঁধবি।'

'আগে দাঁড়াও, কলকাতায় মেয়েদের থাকার জায়গা পাওয়া সহজ নয়। ছেলেদের জন্যে হাজারটা মেস হোস্টেল আছে। মেয়েদের হাতে গোনা। চাইলেই জায়গা পাওয়া যায় না।'

'সেকী রে। এই শুনি কলকাতায় ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'ভাত ছড়াবার ক্ষমতা আমাদের আছে?'

মা গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর নিজের মনেই বলল, 'মেয়েটার ঠিকানা জোগাড় করতে পারলে চিন্তা করতে হত না।'

'তুমি চিন্তা কোরো না। আম চেষ্টা করব।' অবন্তী মায়ের দিকে তাকাল, 'হোস্টেল না পাই পেয়িং গেস্ট হিসেবে হয়তো থাকতে পারব।'

'পেয়িং গেস্ট?' মা অবাক হয়ে তাকাল।

'হ্যাঁ। আজকাল মেয়েরাও থাকছে।'

'কার বাড়িতে থাকবি, সেখানকার ব্যাটাছেলেরা কেমন তা জানিস না। যদি মতলব খারাপ হয়? না-না!'

হাসল অবন্তী, 'অনেক মহিলা আছেন যাঁরা একা বড় বাড়িতে থাকেন। তাঁরা কয়েকটি মেয়েকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে রাখেন কারণ তাতে যেমন আয়ও হয় তেমনি সঙ্গী পাওয়া যায়।'

'ভদ্র মেয়ে?'

'হ্যাঁ গো।'

'কী জানি। তারা তো হোস্টেলের থেকে অনেক বেশি টাকা নেবে!'

'খুব পার্থক্য হবে বলে মনে হয় না। তেমন হলে যাব না।'

'না না। দু-একমাস থেকে হোস্টেল খুঁজে নিস। ওই দু-এক মাস আমি কোনওমতে চালিয়ে নেব।' মা তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

অবন্তী মায়ের দিকে তাকাল। মা কি বাবাকে ভালবাসত? অথবা বাবা কি মাকে? ওদের দুজনের চিন্তাভাবনা তো দুই মেরুর ছিল। সাহিত্যের কোনও খবর রাখে না মা। কবিতা দূরের কথা, গল্প উপন্যাস পড়তে সে কখনও মাকে দ্যাখেনি। ভালবাসা কী তা মায়ের কতখানি জানা কে জানে। সে বলল, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলো।'

'তুমি কি স্বর্ণেন্দুকে অপছন্দ করো?'

মা চমকে গেল। চোখ ছোট হয়ে গেল, 'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'তোমার কথায় আমার মনে হয়েছে।'

'না। সে ভদ্রলোক, স্কুলে পড়ায়। তাকে কেন আমি অপছন্দ করব? তবে হ্যাঁ, লোকে যদি অকথা কুকথা বলে তা হলে সত্যি কথা বলতেই হয়। তুই কুমারী মেয়ে। মাথার ওপর বাবা নেই। মেয়েছেলের মাথার ওপর গার্জেন না থাকলে তাকে সবাই মাঠের ঘাস বলে মনে করে নেয়। যে কোনও গোরু এসে নির্বিবাদে খেয়ে যেতে পারে। তোর নামে দুর্নাম রটছে। এটা যদি ওর কারণে হয় তা হলে আমি মেনে নেব কেন?'

'এক হাতে তো তালি বাজে না। শুধু ওর কারণে কেন, আমিও দেখা করি। আমরা তো বন্ধুও হতে পারি।'

'বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'তুই কি পাগল? তোর চেয়ে ও কত বড় জানিস?'

'বাঃ, বড় হলে বন্ধুত হতে পারে না?'

'না। বন্ধুত্ব করতে হলে দুজনের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকতে হবে। তা ছাড়া আমাদের সমাজে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে না।'

'সমাজ বলতে?'

'তোমার বাবার কাজের সময় যাঁরা এসেছিলেন, বিয়ে থা ইত্যাদির সময় যাঁদের নেমন্তন্ন করা হয় তাঁদের নিয়েই সমাজ।'

'বাবা কিন্তু স্বর্ণেন্দুকে স্বীকার করে নিয়েছিল।'

'কি স্বীকার করেছিল? তোর সঙ্গে টো টো করে ঘুরবে? সিনেমা দেখবে? বই পড়ে পড়ে বাস্তববুদ্ধি চলে গিয়েছিল তার। তা ছাড়া তখনকার সময় আর এখনকার সময় এক নয়। তোকে মনে রাখতে হবে তোর দুটো নাবালক ভাই আছে।'

কথাগুলো ক্রমশ বাঁক পথ নিচ্ছে বলে আর কথা বাড়াল না অবন্তী। আর একটু সময় যাক, মা নিশ্চয়ই ভুল বুঝতে পারবে।

এক তারিখে মাইনে হল। অবন্তী জানল প্রথম মাসে এত তাড়াতাড়ি কেউ মাইনে পায় না। এর সমস্ত কৃতিত্ব বলরামের। সে-ই তার বিল এজিতে পাঠিয়ে পাশ করিয়ে নিয়ে এসেছে। দশ দিনের মাইনে পাওয়া গেল। পরের দিন শনিবার।

স্টেশনে স্বর্ণেন্দু ছিল। আগামীকাল তার পেয়িং গেস্ট হিসেবে যাওয়ার কথা। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন এক তারিখের মধ্যে জানাতে। সেটা মনে ছিল না। অবন্তী বলল, 'কী হবে?'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'কিছু হবে না। আমি দুপুরে কলকাতায় গিয়েছিলাম। বাকিটা ভদ্রমহিলাকে দিয়ে এসেছি। এই নাও রসিদ।'

'রসিদটা হাতে নিয়ে অবন্তী বলল, 'আশ্চর্য! তুমি আমার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা করলে না কেন?'

'আমি একা ছিলাম না। দুজন মাস্টার মশাই ছিলেন, আমরা বোর্ডের অফিসে কাজে গিয়েছিলাম।

'তা হলে কাল যখন যাবে?'

'সেদিনের মতো গেলেই হয়!' স্বর্ণেন্দু বলল।

'আমার খুব খারাপ লাগছে। যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'মন শক্ত করো। শরীরের জন্যেই তোমাকে যেতে হচ্ছে।'

'কিন্তু কথা দাও প্রত্যেক শনি রবি তুমি ওখানে যাবে?'

'দু দিন যাওয়া একটু মুশকিল।'

'না দুদিন!' বাচ্চা মেয়ের মতো মুখ করেছিল অবন্তী।

স্বর্ণেন্দু হেসে ফেলল। অবন্তী বলল, 'জানি। তুমি তো হাসবেই। আমি আউট ফল সাইট হলেই তোমার আউট অফ মাইন্ড হয়ে যাব।'

'তাই?'

'না তো কী! আমি চলে যাচ্ছি অথচ তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।'

'কি করলে সেটা বুঝবে?'

অবন্তী নিশ্বাস ফেলেছিল, 'কাল ওই একই ট্রেনে যাব।'

বাড়িতে ফিরে এসে অবাক হয়েছিল সে। বাইরের ঘরে এক ভদ্রলোক বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে দেখে মা বলল, 'ওই তো, মেয়ে এসে গিয়েছে।'

লোকটা মোটাসোটা। মুখটা বড়, থলথলে।

'আপনি অবন্তী চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল। আমি থানা থেকে আসছি। আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট আমাকে পাঠাতে হবে।'

'ও।'

'আগে আমরা রিপোর্ট না পাঠালে চাকরিতে যোগ দিতে দেওয়া হত না। আজকাল হচ্ছে। তবে আমরা রিপোর্ট খারাপ দিলে চাকরিটা টেম্পোরারি থেকে পার্মানেন্ট হচ্ছে না।'

'তা হলে?'

'ওই টারমিনেট করে দিচ্ছে। আবার বেকার হয়ে যেতে হচ্ছে।'

'ও।'

'আপনি এখানার কলেজেই পড়তেন?'

'হ্যাঁ।'

'ছাত্ররাজনীতি করতেন?'

'না।'

'আরে ভয় নেই, বলুন না। একসময়, প্রফুল্ল সেনের আমলেও এস এফ আই করলে চাকরি চলে যেত। নকশাল হলে তো কথাই নেই। এখন ওসব হয় না। করেছেন?'

'না।'

'এমনি রাজনীতি?'

'না।'

'এ্যান্টি সোস্যাল এ্যাক্টিভিটিস?'

'না।'

'কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে?'

এবার মা বলল, 'আমার মেয়ে ওরকম নয়। ওই শিক্ষা ওকে দিইনি আমরা। ওর বাবা মাস্টারমশাই ছিলেন।'

'কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে ভেজা বেড়াল অথচ বাইরে বাঘ এমন অনেক কেস আমি জানি। আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু উনি যে বাইরে কারও সঙ্গে প্রেম করছেন না তার প্রমাণ কী? এখান থেকে কলকাতায় যেতে আসতেও কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। অফিসেও ব্যাচেলার ছেলেরা কাজ করে নিশ্চয়ই।'

'আমার সঙ্গে কারও ঘনিষ্ঠতা আছে কিনা সেটা রিপোর্টে লিখতে হবে?'

'না। তবে সেই লোকটির খোঁজ খবর নিতে হবে। সে যদি এ্যান্টি সোস্যাল হয় তা হলে আপনি তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। পারেন কেন, হবেনই। নামটা বলুন।'

'কার নাম বলব?'

'আঃ। যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে তার নাম বলুন।'

'জীবনানন্দ দাস।'

লোকটা ঝটপট লিখে নিল নামটা, 'কোথায় থাকে?'

'ওঁর বাড়ি ছিল বরিশালে।'

'সে তো আমারও ছিল। আসতে শাল যেতে শাল-। হে হে। এখন কোথায় থাকে?'

'কলেজ ষ্ট্রিটে। এবার আমি ভেতরে যেতে পারি? আমি খুব টায়ার্ড'। অবন্তী শক্ত গলায় প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই পারেন। তবে আপনার সব ঠিক আছে কিন্তু জীবনানন্দ আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে।'

'কীরকম?'

'আমি যদি রিপোর্টে লিখি জীবনানন্দ দাশ নামে এক সমাজবিরোধীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে, বুঝতেই পারছেন কী হবে?'

'পারছি।'

'অবশ্য আমি যে লিখবই তা ভাববেন না।'

মা বলল, 'ওর কোনও ক্ষতি হবে না তো? আমি আপনাকে বলছি ওর সঙ্গে জীবনানন্দ না কি, তার সঙ্গে কোনও আলাপই নেই।'

'বাঃ, উনি বললেন আছে, নিজের কানেই তো শুনলেন!'

অবন্তী বলল, 'আমি বলিনি আলাপ আছে। বলেছি ঘনিষ্ঠতা আছে। উনি আমার শৈশবেই ট্রাম-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।

'শৈশবেই যে মারা গেছে তার সঙ্গে বড় হয়ে ঘনিষ্ঠতা হল কেমন করে? যাক গে, অবাস্তব কথাবার্তায় আমি নেই। তা হলে?'

'বলুন!' অবন্তী তাকাল।

'মেয়েছেলের সঙ্গে কারবার করা খুব ঝামেলায় ব্যাপার।' লোকটার গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়ল, 'আরে, এত দূরে এলাম, সময় নষ্ট করলাম তার একটা দাম আপনারা দেবেন না?'

সঙ্গে সঙ্গে মা ভেতরে চলে গেল। এবং পলকেই বেরিয়ে এসে লোকটির হাতে তিনটে দশ টাকার নোট তুলে দিল। লোকটা মাথা নাড়ল, 'মাত্র তিরিশ?'

'আর পারব না বাবা। উনি তো কিছু রেখে যাননি। অনেক কষ্টে সংসার চালাচ্ছি। আপনি এই নিয়েই খুশি হন।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল, 'যাক, বাবা বললেন বলে আর চাপ আমি দিলাম না। আচ্ছা, আসি।'

দরজা বন্ধ করে মা ফোঁস করে উঠল, 'লোকটাকে মিথ্যে কথা বললি কেন? তোর চাকরিটা চলে গেলে ভাল হত?'

'মিথ্যে কথা বলিনি তো।'

'বলিসনি? স্বর্ণেন্দুর নাম চাপা দিতে একটা নাম বানিয়ে বললি?'

অবন্তী ভেতরের ঘরে গেল। মা এল পেছন পেছন। আলমারি থেকে বাবার কেনা বইটা বের করে বলল, 'কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় তোমার স্বামী ছিলেন। কিন্তু তুমি তো কখনই তাঁর মনের খবর রাখতে চাওনি। এই বইটা হাতে নিয়ে কখনও দেখেছ? বাবা আমাকে এঁর কবিতা পড়তে শিখিয়েছিলেন। আমি এঁর নাম বলেছি।' বইটাকে রেখে ব্যাগ খুলে খামটা এগিয়ে ধরল সে, 'এতে দশ দিনের মাইনে আছে। আর কাল আমি কলকাতায় চলে যাব।'

মা একটু থতমত হয়ে বলল, 'আমি কেন, ওই লোকটা তো শিক্ষিত, পুলিশে কাজ করছে, ও কি তোর রসিকতা বুঝতে পারল? অত মেজাজ ভাল নয়। কলকাতায় যাব মানে, থাকার জায়গা পেয়েছিস?

'হ্যাঁ। পেয়িং গেস্ট।'

'অফিসের কাছে?'

'না। তালতলায়। ঠিকানা লিখে রেখে যাব।'

'মাস গেলে কত?'

'চারশো।'

'সর্বনাশ।'

'ওর নীচে বর্ধমানেও জায়গা পাওয়া যাবে না।'

'তা হলে আর কত বাড়িতে দিতে পারবি।'

'তুমি চেয়েছ আমি যাই।'

'কেন? তুই বলিসনি? এখান থেকে যাতায়াতের অসুবিধের কথা যখন বলেছিলি তখন আমি আপত্তি করিনি?'

'করেছ। তারপরে আচমকা আমাকে যেতে বললে। এখন সর্বনাশ বলে কোনও লাভ নেই। যা মাইনে পাব তা থেকে থাকা-খাওয়ার খরচ আর সামান্য হাতখরচের জন্যে রেখে বাকিটা তোমাকে দিয়ে যাব। চিন্তা কোরো না।' অবন্তী কথা শেষ করল।

স্বর্ণেন্দু তাকে পৌঁছে দিল। হাওড়া থেকে ট্যাক্সি করে সোজা তালতলায়। বলল, 'আমার তো ওপরে যাওয়া নিষেধ। আমি এখানে বসছি, তুমি ওপরে গিয়ে আর একবার চেক করো। যদি কোনও জিনিস নিয়ে আসাতে ভুলে গিয়ে থাক তো বলো, এনে দিচ্ছি।'

এ বাড়িতে চাকর নেই। কাজের জন্যে দুটো প্রৌঢ়া আছে। তাদের সাহায্যে জিনিষগুলো নিয়ে ওপরে এসে অবন্তী দেখল ভদ্রমহিলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'ওয়েলকাম। এই তোমার ঘর। ওপাশেরটায় আমি থাকি। মন ভাল না থাকলে মাঝেমাঝে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসব। আপত্তি আছে?'

'ওমা! আপত্তি থাকবে কেন?'

গুছিয়ে নিতে মিনিট দশেক লাগল। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নিচু গলায় বললেন, 'ওপাশের ঘরে চার জন আছে, কথা বললে বলো, তবে বেশি মাখামাখি কোরো না।'

'ওরাও কি চারশো দেয়?'

'না না। একটা ঘর দুজন শেয়ার করে বলে পঞ্চাশ কম দেয়।'

'ওখানে কালি হওয়ার কোনও চান্স নেই?'

'কেন? তুমি সিঙ্গল রুম পেয়েছ। ভালই তো।'

'পঞ্চাশ টাকা কম হলে আমার বেশি ভাল হত।'

ভদ্রমহিলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অবন্তী তার নিয়ে আসার জিনিসগুলো দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল পেস্ট আনা হয়নি। বাড়িতে তার আলাদা পেস্ট ছিল না। পেস্ট দরকার আর একটা তালা। যখন থাকবে না তখন নিশ্চয়ই তালা দিতে হবে। নীচে নেমে দেখল স্বর্ণেন্দুর সামনে ভদ্রমহিলা গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

'কিছু লাগবে?' স্বর্ণেন্দু উঠে দাড়াল।

মাথা নাড়ল অবন্তী, 'পেস্ট নিয়ে আসিনি। আচ্ছা দরজায় কি তালা দেব? মানে যখন অফিসে যাব—!'

'তালা দিলে আমার কোনও দায়িত্ব থাকে না।'

'তা হলে একটা ছোট তালা।'

'কী পেস্ট ব্যবহার করো?'

'নিম।'

স্বর্ণেন্দু জিনিষদুটো দিয়ে চলে গেল। ওদের স্কুলে ফোন আছে। নাম্বারটা অবন্তীর জানা। খুব দরকার হলে অবন্তী যেন ফোন করে। সামনের শনিবার স্বর্ণেন্দু দেখা করতে আসবে। এইসব কথা বলার সময় অবন্তীর মনেই হল না যে স্বর্ণেন্দু কষ্ট পাচ্ছে। পুরুষ মানুষরা বোধহয় এমন নির্মম হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখ মনে এল। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করল অবন্তী, নির্মমই তো। নইলে বাবা কেন চলে গেল!

'আসব?'

গলা শুয়ে দরজার দিকে তাকাল অবন্তী। ঝট করে চোখের কোন মুছে উঠে বসল,

'আসুন।

'মন খারাপ লাগছে?' দুজনের মধ্যে যিনি বয়স্কা তিনি প্রশ্ন করলেন।

'একটু!'

'এই প্রথম বাড়ির বাইরে থাকা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম অশোকা। আমি স্কুলে পড়াই। আর এ হল বিপাশা। ও এম এ পড়ছে।'

'আমি অবন্তী। সবে সরকারি চাকরি পেয়েছি। বর্ধমানে বাড়ি। বসুন।'

অশোকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখান থেকে তো অনেকেই চাকরি করতে আসে।'

'আমিও আসতাম। কিন্তু খুব কষ্ট হয়। তারপর ট্রেন বন্ধ হলে সর্বনাশ।'

'তা ঠিক।' বিপাশা বলল, 'বাস বন্ধ হলে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে চোখে সর্ষেফুল দেখি।'

'আপনারা অনেকদিন এখানে আছেন?'

বিপাশা বলল, 'অশোকাদি আছেন সাতবছর। আমি দেড়।'

অশোকা বললেন, 'আমার বাড়ি যাদবপুরে। বিয়ে হয়েছিল বাগবাজারে। বিয়ের পর মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম। হল না। দশ বছর পর আলাদা হলাম। আমাকে ডিভোর্স দেবে না। এখন একা থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।'

গল্প হচ্ছিল। এঁদের ভাল লাগছিল অবন্তীর। বিপাশাকে দেখে তার মনে পড়ল, বাবা বেঁচে থাকলে সে-ও এম. এ পড়ত। বিপাশার বাড়ি ইসলামপুরে। হোস্টেলে জায়গা পায়নি বলে এখানে এসেছে।

'আরও দুজন এখানে আছেন, না?'

'হ্যাঁ। ওরা যে যার বাড়িতে গিয়েছে। প্রতি হপ্তায় যায়।'

হঠাৎ বিপাশা বলল, 'এই ঘরে কেউ বেশি দিন থাকে না।'

'তার মানে?'

'কেউ এক মাস, কেউ দুমাসে চলে যায়। অশোকাদি বলেন, এই ঘরটা নীলার মতো, সবার সহ্য হয় না।'

'কেন?'

'তা জানি না। এ ঘরে যারা আসে তারা পঞ্চাশ টাকা বেশি দেয় বলে আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না। সিঙ্গল রুম ডাবল রুম বলে কথা।' হাসল বিপাশা।

এইসময় একজন পরিচালিকা চা আর পাঁপড়ভাজা নিয়ে ঢুকল।

'আমাদেরটা এখানে দিয়ে যাও টগরদি।' বিপাশা বলল।

'নিয়ম ভাঙতে পারব না। যে যার চা নিজের ঘরে বসে খাবে, নিয়মটা তো জানা আছে।' টেবিলের কাপ প্লেট নামিয়ে টগর চলে গেল। বিপাশা বলল, 'এখানে আর কিছু না থাক নিয়মের বাড়াবাড়ি আছে। চলো অশোকাদি, ওগুলো গেলে আর মুখে তোলা যাবে না। আসি ভাই।'

অশোকাদি বললেন, 'যখনই ইচ্ছে হবে আমাদের ঘরে চলে আসবে।'

একদম অন্য একটা জীবন, যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। সকালে চা খাওয়ার পর কোনও কাজ নেই। চুপচাপ শুয়ে বসে সময় কাটিয়ে স্নানটান শেষ করে নীচে গিয়ে খেতে বসা। এ বাড়ির রান্না সাড়ে আটটার মধ্যেই হয়ে যায়। ন'টার সময় বেরিয়ে নিজেকে বোকা লেগেছে অবন্তীর। ন'টার সময় স্বচ্ছন্দে বাস ট্রামে ওঠা যায়। তালতলা থেকে ট্রামে চেপে গর্ভনর হাউসের পাশে মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে ফাঁকা ডালহৌসি দেখতে হয়। অফিসের দরজা খোলে পৌনে দশটায়। সাড়ে দশটার আগে হাতে গোনা লোক আসে। আবার সাড়ে ন'টায় বাসে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে। ভিড় শুরু হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও ওই সময়টাই ঠিক করল অবন্তী। ভূতের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থেকে বাসের ভিড় ঠেলা ঢের ভাল। অবশ্য বাসের চেয়ে ট্রামে সে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল।

মিস্টার সেন তাকে ক্রমশ জটিল কাজ দিচ্ছেন। সেটা করতে ভাল লাগছিল। কাজের চাপ থাকায় অন্য কোনও দিকে মন যায় না। দিব্যি সময়টা কেটে যায়। টিফিনের সময় মেয়েদের ক্যান্টিনে গেলে এ কারণে কথা শুনতে হয়েছে তাকে। একজন বললেন, 'সরকারি অফিসে ঢুকে যদি ভাব ক্লাজ দেখারে কুব তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাবে তা হলে তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছ।'

'আমি কোনও পাওয়ার জন্যে কাজ করছি না।'

'ওমা। এ যে সন্ন্যাসিনী। মাইনেও নেবে না নাকি।' আর একজন হেসে উঠল, 'ওসব বড় বড় কথা প্রথম দিকে মুখ থেকে বের হয়।'

এইসময় একজন ভদ্রমহিলা ক্যান্টিনে ঢুকে সোজা কাউন্টারের সামনে চলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাখাল, একশোটাকার ভাঙানি হবে?'

'না দিদি। এখনও বিক্রি হয়নি তেমন।'

'তোমার তো কখনই বিক্রি হয় না।' ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

অবন্তী দেখল সবাই কথা বন্ধ করে দৃশ্যটা দেখল। যে ভদ্রমহিলাকে বেঞ্চিতে ঘুমাতে দ্যাখে প্রায়ই, তিনি বললেন, 'কপাল করে এসেছে।'

যিনি অবন্তীকে ঠেস দিয়ে কথা বলছিলেন তিনি বললেন, 'ঘেন্নায় শরীর রি রি করে।'

ঘুম ঘুম মহিলা বললেন, 'তাতে কোনও লাভ নেই। শাড়িখানা দেখেছ। মিনিমাম সাতশো।'

'অতই যখন শখ তুমি ওকে ফলো কারো, পরতে পারবে।'

'আর হয় না। সংসারের জন্যে খেটে খেটে ছিবড়ে হয়ে গেছি।'

ওদের কথাবার্তায় অবন্তী জানতে পারল ভদ্রমহিলার নাম রাণু রায়। এই অফিসের টেলিফোন

অপারেটার। মাইনে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের কিন্তু রোজ শাড়িজামা পাল্টে পরেন। একমাসে একটা শাড়ি দুবার নয়। ট্যাক্সি ছাড়া যাতায়াত করেন না। রোজ দুপুরবেলায় ঘন্টা দুয়েক অফিসে থাকেন না। এই অফিস তো বটেই, হেড অফিসের কর্তাদের দরজা ওর কাছে অবারিত। দুপুরবেলায় উনি তাঁদের এক একজনের সঙ্গে সময় কাটান। কাজ উদ্ধারের জন্যে বাইরের পার্টিরা ওঁকে ধরে অতএব টাকা ওঁর হাতে ময়লা।

অবন্তী একটুখানি যা দেখেছিল তাতে ভদ্রমহিলাকে গম্ভীর এবং পরিচ্ছন্ন রুচির মানুষ বলে মনে হয়েছিল। ওর কাজকর্মের বর্ণনা শুনে প্রশ্ন এল মনে, ঈর্ষায় এঁরা বাড়িয়ে বলছেন না তো। উপন্যাসে এই ধরনের চরিত্র পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংসারের অভাব দূর করতে না পেরে মেয়েরা বাধ্য হয় ওই জীবন যাপন করতে। যেহেতু ওই জীবন কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না তাই অকালেই শেষ হয়ে যায় এরা। অবন্তী জানল, এই রাণু রায় অফিসের কোনও মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না। সহকর্মীদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেও তাকে দেখা যায় না।

হাওড়া স্টেশনে যাওয়া যত কষ্টকর তালতলায় ফেরা ততটা নয়। একটু হেঁটে এসপ্লানেড থেকে ট্রাম ধরলে বসার জায়গা পাওয়া যায় লেডিস সিটের দৌলতে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই বাড়িতে ফিরে আসে সে। মাঝে মাঝে মালিকানের সঙ্গে দেখা হয়। আজকাল তিনি বেশ হাসি হাসি মুখেই কথা বলেন, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না।'

'হলেই বলবে। এটা তোমার নিজের বাড়ি। লজ্জা কোরো না।'

একটু অবাক হয়েছিল শুনে। একবার ভেবেছিল জিজ্ঞাসা করবে কেন সে যে ঘরে আছে সেই ঘরে বেশিদিন কেউ থাকে না। জিজ্ঞাসা করেনি। কারণ তা হলে তাকে বলতে হবে কার কাছ থেকে সে খবরটা শুনেছে। ঘরে ঢুকে পরিষ্কার হয়ে বসতে না বসতেই চা আর পাঁপড় ভাজা এসে যায়। তারপর আর সময় কাটতে চায় না। অবন্তী অনেকবার ভেবেছে অশোকাদিদের ঘরে গিয়ে কতা বরে আসে। কিন্তু সংকোচ হয়েছে। ছুটির দিন হলে আলাদা কথা, কাজ থেকে ফিরে হয়তো ওঁরা বিশ্রাম করছেন, গেলে বিরক্ত করা হবে। কিন্তু এই ভেবে বোবা হয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। যেটা পরবর্তী জীবনে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিল তাকে।

প্রথম শনিবারে ঠিক সময়ে তৈরি ছিল অবন্তী। খবর পাওয়ামাত্র নীচে এসে দেখল মালিকানের সামনে স্বর্ণেন্দু বসে আছে। তাকে দেখে মালিকান বললেন, 'অবন্তী, এই ভদ্রলোককে বলেছি এখানে না এসে অন্য জায়গায় তোমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। উনি এসে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে পাড়ার মানুষ কৌতূহলী হবেই। তুমি বুঝতে পারছ?'

'ঠিক আছে।'

গলি থেকে বড়রাস্তায় আসার সময় অবন্তী লক্ষ করল কিন্তু কোনও কৌতূহলী মুখ দেখতে পেল না। সে বলল, 'এত গার্জেনগিরি আমার ভাল লাগে না। আমি যেন বাচ্চা মেয়ে—!'

স্বর্ণেন্দু হাসল, 'ছেড়ে দাও। কেমন আছ বলো?'

'ভাল না।'

'কী অসুবিধে হচ্ছে?'

'তুমি বুঝবে না।'

'বুঝিয়ে বললে বুঝব না কেন?'

'তোমার কী? তুমি বাড়িতে আছ, স্কুল করছ, কোনও চিন্তা ভাবনা নেই। আমার কী ভাবে দিন কাটছে তা ভেবেছ?'

স্বর্ণেন্দু গম্ভীর হল। 'দ্যাখো, তুমি হোস্টেলে আছ না তোমার বাড়িতে তাতে আমার অবস্থার তো হেরফের হচ্ছে না। এখানে যেমন অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে, বাড়িতেও তেমনি। তোমার সম্পর্কে ভেবে সক্রিয় হতে পারি যখন তুমি আমার বাড়িতে আসবে।

'তোমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

অবন্তীর মুখে রক্ত জমল।

'তুমি যদি মত দাও তা হলে তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি। কী, রাজি আছ?' স্বর্ণেন্দু

তাকাল।

'এখনই না।'

'কেন?'

'বাবার মৃত্যু তো বেশি দিন হয়নি।'

'ও। কী একটা এক বছরের নিয়ম আছে, না? তোমার মা অবশ্য তাই বলবেন। যদিও আমি ওগুলো নেহাতই বাজে বলে মনে করি।'

'যা বলার আমি বলব।' অবন্তী বলল।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা মেট্রো সিনেমার সামনে চলে এসেছিল। কাফে দ্য মনিকোয় ঢুকল স্বর্ণেন্দু। চা আর ফ্রাই-এর অর্ডার দিয়ে বলল, 'তুমি এর মধ্যে বেশ অন্যরকম হয়ে গেছ।'

'কী রকম?

'আত্মবিশ্বাস এসে গেলে মানুষের চেহারা যেরকম হয়ে যায়।'

'ও বাবা! কী রকম হয়ে যায় জানি না। আমি তো প্রতিটি দিন গুনেছি আর ভেবেছি কবে শনিবার আসবে। এত বড় শহরে কাউকে চিনি না!'

'অফিসের মহিলাদের সঙ্গে আলাপ হয়নি?'

'হয়েছে। তারা সবাই পরিশ্রান্ত। অন্যের সমালোচনা করা ছাড়া কোনও কথা খুঁজে পান না। আমার সঙ্গে মিলবে না।'

'বাড়ির খবর পেয়েছ?'

'না। এসেই একটা চিঠি দিয়েছিলাম। জবাব আসেনি এখনও।'

'আমি ভেবেছিলাম সকালে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব। তারপর মনে হল আমি কলকাতায় আসছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এটা শুনতে ওঁর ভাল লাগবে না।' স্বর্ণেন্দু ম্লান হাসল।

'তুমি স্কুলের চাকরিটার খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি। পার্টির ক্যান্ডিডেট আছে।'

'তা হলে তো আমার হল না।'

'দেখা যাক।'

'একটা কিছু তো করতে হবে। এভাবে চলবে নাকি?'

'কেন?'

'আশ্চর্য। বিয়ের পর আমি কলকাতায় একা থাকব নাকি?'

'একা থাকবে কেন?'

'দ্যাখো, ভাইরা যদ্দিন রোজগার না করছে তদ্দিন আমাকে চাকরি করতেই হবে। বর্ধমান থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারব না। তা হলে বিয়ের পর আমাদের আলাদা থাকতে হয়।'

'হ্যাঁ। তোমার একটা চাকরি ওখানে পাওয়া দরকার। আর নয় তো আমি কলকাতায় চলে আসি। এখান থেকে বর্ধমানে যাতায়াত করব। অনেকেই তো করে।'

হাত জোড় করল অবন্তী, 'মাপ করো', সকাল সাতটায় বেরিয়ে যাবে ফিরবে রাত ন'টায়। এসে মড়ার মতো ঘুমাবে। এরকম জীবন আমার চাই না।'

কথা হল অনেক, কিন্তু কোনও সমাধানে আসা গেল না। সমাধান একটাই, হয় অবন্তীকে বর্তমানে চাকরি পেতে হবে নয় স্বর্ণেন্দু কলকাতায় চাকরি খুঁজে নেবে। এই দুটো যেন সুদূরের।

যাওয়ার সময় স্বর্ণেন্দু বলল, 'কাল আড়াইটের সময় মেট্রোর সামনে এসো। এই সিনেমাটা দেখব।'

'তুমি কাল আসবে? সত্যি?'

'বাঃ তাই তো কথা ছিল।' আগাম টিকিট কেটে একটা সে অবন্তীর হাতে দিল, 'বাইরে দাঁড়াবার দরকার নেই।'

ঘরে ফিরে এসে অবন্তীর মনে হল সে স্বর্ণেন্দুর ওপর একটু বেশি চাপ দিচ্ছে। যে কোনও মানুষ পরপর দু দিন বর্ধমান থেকে কলকাতায় এসে ক্লান্ত হবেই। তা ছাড়া ছুটির দিনে ওর নিজের কিছু কাজকর্ম থাকতে পারে। পরের দিন ছবি দেখে বেরিয়ে অবন্তী বলল, 'শোনো, সামনের শনিবার তুমি এসো না।'

'কেন!'

'কোনও কারণ নেই। তুমি রবিবারে এসো। সকাল সকাল। ধরো এগারোটার মধ্যে এখানে, এই মেট্রো সিনেমার সামনে। আমরা বাইরে খাব, একটু ঘুরব। শনিবার তুমি অন্য কাজ কোরো।'

'তুমি রাগ করে বলছ না তো?'

'আশ্চর্য। তুমি সব সময় আমাকে রাগতেই দ্যাখো, না?'

শনিবার তুমি কী করবে?'

'দেখি। ও হ্যাঁ, আমাকে কয়েকটা বই এনে দেবে?'

'কী বই?'

'যে কোনও মোটা উপন্যাস আর জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সামনের রবিবার মনে করে নিয়ে এসো, হ্যাঁ?'

ঘরের তালা খুলছিল, বিপাশা ডাকল, 'অবন্তী, কোনও কাজ না থাকলে এসো না।'

অবন্তী হাসল। ওদের ঘরে ঢুকে দেখল অশোকাদি খাতা দেখছেন। ওকে দেখে অশোকাদি উঠে বসলেন, 'এসো এসো।'

'আমি আপনার কাজের ব্যাঘাত করলাম না তো?'

'আরে না না। বসো। বেরিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। সিনেমায় গিয়েছিলাম।' অবন্তী বসল।

বিপাশা চোখ বড় করল, 'তোমার তো সাহস খুব, একা একা সিনেমায় গিয়েছিলে।'

অবন্তী খাতাগুলো দেখল, 'আপনাকে দেখে বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবাও ওরকম গাদাগাদা খাতা বাড়িতে নিয়ে আসত।

'উনি শিক্ষক ছিলেন বুঝি?' বিপাশা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ইংরেজি পড়াতেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য নখদর্পণে ছিল।'

'তুমি নিশ্চয়ই কিছুটা পেয়েছ?' অশোকাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না-না। আমি সাধারণ।' মাথা নাড়ল অবন্তী।

'তোমার গলাটা কিন্তু ভারী মিষ্টি। আবৃত্তি কর?'

'দূর।'

'দূর বললেই হল। প্লিজ একটা আবৃত্তি করো।' বিপাশা বলল।

দুজনে এমনভাবে অনুরোধ করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করতে পারল না অবন্তী। সে চোখ বন্ধ করে উচ্চারণ করল, 'আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি/ আবার বছর কুড়ি পরে/হয়তো ধানের ছড়ার পাশে/ কার্তিকের মাসে/ তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী/ নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভেতরে।'

কবিতাটা শেষ করার পর চোখ খুলল অবন্তী।

অপলক তাকিয়েছিলেন অশোকাদি। বিপাশা হাততালি দিয়ে বলল, 'অপূর্ব। অপূর্ব। তোমাকে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আবৃত্তি করতে ডাকব। কী দারুণ বললে।'

অবন্তী লজ্জা পেল, 'যাঃ। কী যে বলো।'

অশোকাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জীবনানন্দ তোমার ভাল লাগে?'

'হ্যাঁ। কী রকম একটা রহস্যের ছোঁয়া আছে ওঁর লাইনে।'

অনেকক্ষণ গল্প হল। হঠাৎ অশোকাদি বললেন, 'তোমাকে একটা খবর দিই। এই বিপাশা হল মরসুমি ফুলা পড়া শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে যাবে, বিয়ে করবে, সুখী হবে। আমাকে তোমাকে তো যতদিন চাকরি করব এরকম জায়গায় থাকতে হবে। সরকার একটা ওয়ার্কিং উওমেন হোস্টেল তৈরি করেছেন। আমি দরখাস্ত করছি। তুমি চাইলে করতে পার।'

'সেখানে তো প্রচুর দরখাস্ত পড়বেআমি কি পাব?'

'দ্যাখো, লটারি হবে। কপাল ভাল হলে পেয়ে যাবে। আবেদন করতে দোষ কী?'

'কোথায় আবেদন করতে হবে?'

'আমি সব খবর নিয়ে তোমাকে জানাব।'

বিপাশা বলল, 'তোমাদের এই কথাবার্তা শুনলে বাঘিনী খেপে যাবে।'

অবন্তী অবাক হল, 'বাঘিনী?'

বিপাশা বলল, 'হুংকার শোননা। এখানে এই চলবে না, ওই চলবে না। আমরা যে ভদ্র পরিবার থেকে এসেছি তাই উনি ভুলে যান।'

অশোকাদি বললেন, 'আসলে এসব করে কারণ ওর বাজে অভিজ্ঞতা আছে। কয়েক বছর আগে পাশের ঘরে দুটি মেয়ে থাকত। তারা রাত দুপুরে বাড়ি ফিরত, দুপুর অবধি ঘুমাত। উলটোপালটা ফোন আসত। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এল, ওদের ধরে নিয়ে গেল। তারপর থেকেই এইসব নিয়ম চালু করেছে।'

মাইনে পেয়ে বর্ধমান রওনা হল অবন্তী। সকালেই মালিকানকে বলেছিল কথাটা। ভদ্রমহিলা গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'তা হলে তোমার পাঁচটা মিল বাদ যাবে।'

'পাঁচটা কেন? আজ রাত্রে খাচ্ছি না, শনি রবি চারটে আর সোমবার সকালেরটাকে ধরলে ছটা।' অবন্তী প্রতিবাদ করল।

'আজ রাত্রের বাজার হয়ে গিয়েছে। তুমি যদি গতরাত্রে বলতে তা হলে ছটা হত। ভুল ধরার চেষ্টা কোরো না।'

তর্ক করে লাভ নেই। এই বাড়িতে থাকার সবচেয়ে ভাল দিক হল নিরাপত্তা। কলকাতা শহরে সেটা সবচেয়ে আগে দরকার।

মিস্টার সেনকে বলে সে দুপুরের পরই স্টেশনে ছুটেছিল। একবার ভেবেছিল দুটো ভাই আর মায়ের জন্যে কিছু কিনে নেবে। কিন্তু তারপরে মনে হয়েছিল পুরো টাকা মায়ের হাতে তুলে দিলে মা বেশি খুশি হবে।

বিকেলবেলায় বর্ধমানে পৌঁছে ও একটু হতাশ হল। স্বর্ণেন্দু জানে সে আজ আসছে। কিন্তু গত সপ্তাহে ওকে বলা হয়নি কখন আসবে। স্বাভাবিকভাবে ও সন্ধের পরেই স্টেশনে আসবে। আসলে অতগুলো টাকা নিয়ে অফিসটাইমের ভিড়ে ও ট্রেনে উঠতে চায়নি, কিন্তু এটা আগে মাথায় আসেনি।

গলির মুখ থেকেই সে শুনতে পেল হেমন্ত চিৎকার করে বাড়ির দিকে ছুটছে, 'দিদি এসেছে, দিদি এসেছে।'

মা দরজা খুলল। একগাল হেসে বলল, 'আয়।'

ঘরে ঢুকে বাবার চেয়ারে ধপ করে বসে অবন্তী বলল, 'কেমন আছ?'

'আছি। তুই দেখছি একটু মোটা হয়েছিস?' মা তাকাল।

'আমি? সত্যি?'

'কেন? জামা টাইট হচ্ছে না?'

'কী জানি।' ব্যাগ খুলে খামটা বের করল, 'এই নাও।'

'কী?'

'মাইনের টাকা।'

'বাবা। আসামাত্র বের করে দিতে হল। লোকে শুনলে বলবে কী?'

'শুনছে তো এই দুটো বিচ্ছু।'

হেমন্ত বলল, 'এই দিদি, এবার আমাকে ফুলফপ্যান্ট কিনে দিবি?'

মা ধমকে উঠল, 'এ্যাই, চুপ কর।' খামটা নিল মা, 'ওখানে কী খেতে দিত?'

'একবেলায় মাছ বা ডিম, আর একবেলায় নিরামিষ।'

'মাংস দেয় না?'

'মাসে একদিন, এক তারিখে, রাত্রে।'

'ওমা, আজই তো এক তারিখ। তুই মাংস না খেয়ে এলি?'

'তা হলে কাল আসতে হত।'

'এই যে তুই থাকছিস না, তার জন্যে টাকা ফেরত দেবে?'

অবন্তী মায়ের দিকে তাকাল, 'জিজ্ঞাসা করিনি।'

'এইসব কথা জিজ্ঞাসা করে নিবি তো। কী রকম মেয়ে তুই! যা, হাত মুখ ধুয়ে নে। আমি চা করছি।'

ভাই দুটো আজ পায়ে পায়ে ঘুরছিল। চা খেয়ে সে যখন ছাদে গেল তখন ওরাও সঙ্গী হল। ছাদে উঠে হেমন্ত বলল, 'এই দিদি, তুই অনেক টাকা মাইনে পেয়েছিস, না?'

'দূর!'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'কে বলল তোকে?'

'ওপাশের বাড়ির কাকিমাকে মা বলছিল।'

'ও।'

'এখন থেকে আমরা রোজ মাছ খেতে পারব; না?'

বসন্ত চিনচিনে গলায় বলেছিল, 'আর মাংস?'

'মাংস রাঁধলে মায়ের গন্ধ সহ্য হয় না। দিদি এলে মাংস হবে। মাসে একবার। একদম বায়না করবি না।' ভাইকে ধমক দিল হেমন্ত।

অবন্তী ওদের মুখে দিকে তাকিয়ে অবাক হল। দুজনেই তাদের ইপ্সিত খাদ্যদ্রব্যের কথা ভেবে কী সুখী। খুব মায়া লাগল তার। ছেলেবেলায় তার খাবারের ওপর লোভ ছিল না। পদিপিসির বর্মী বাক্স বইটার জন্যে সে কীরম লালায়িত ছিল। বাবা যেদিন বইটা কিনে আনলেন সেদিন মনে হয়েছিল সমস্ত পৃথিবী মুঠোয় চলে এসেছে।

সন্ধের পরে তাকে কাপড় বদলাতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'একটু ঘুরে আসি।'

'এই রাত্রে বর্তমানে ঘোরার জায়গা আছে নাকি!'

'মা, আমি এখানে জন্মেছি। বন্ধুরা নেই?'

'শুধু বন্ধু হলে কাল সকালেও যাওয়া যেত!'

'কী বলতে চাইছ?'

'কী বলব? এতদিন বাদে বাড়ি এলি, কোথায় বাড়িতে থাকবি, তোর সব গল্প বলবি না পাড়া বেড়াতে চললি!'

অবন্তী সহজ হল, 'তোমার রান্না শেষ হওয়ার আগেই চলে আসব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উড়ে এল অবন্তী। একটা রিকশা আসছিল। তাকে থামিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই সে মাথা নাড়ল, 'স্টেশনের দিকে যাব না দিদি। হেভি মারপিট হচ্ছে।'

'সেকী? কখন?'

'এই একটু আগে। হকারদের সঙ্গে পুলিশের। ওদিকে যাবেন না।'

'আমি তো একটু আগে এলাম।'

রিকশাওয়ালা ঘাড় নেড়ে চলে গেল রিকশা নিয়ে। ওই সময় কতগুলো ছেলে বলতে বলতে গেল, 'চারজনের কন্ডিশন সিরিয়াস। পুলিশ বেধড়ক পিটিয়েছে। হকারদের কিছু হয়নি, মার খেল ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা।' অবন্তী ওদের জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে গেল। স্বর্ণেন্দুর কিছু হয়নি তো? অবন্তী হাঁটতে আরম্ভ করল।

স্টেশনের কাছাকাছি দোকানগুলো বন্ধ। রাস্তার আলোগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে কারা। ট্রেনের যাত্রীরা হেঁটে আসছে মাথার ওপর দুহাত তুলে। পুলিশ গিজগিজ করছে। অবন্তী আর একটু এগোল।

একজন পুলিশ অফিসার মাইকে চেঁচিয়ে বললেন, 'যাঁরা ট্রেন ধরতে এসেছেন প্ল্যাটফর্মের ভেতরে চলে যান, যারা ট্রেন থেকে নেমেছেন তাঁরা বাড়ি চলে যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

অবন্তীর একবার মনে হল বাড়িতে খোঁজ করা দরকার। স্বর্ণেন্দু যদি বাড়ি ফিরে না গিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। ঠিক তখনই শুনতে পেল 'চলো, চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

আবছা আলোয় স্বর্ণেন্দু পাশে এসে দাঁড়াল, 'চলো।'

দ্রুত হেঁটে ওরা স্টেশনের অনেকটা দূরে চলে এল। স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ট্রেনে এলে?'

'আমি দুপুরের ট্রেন ধরেছি। তোমাকে জানাতে পারিনি। তোমার কিছু হয়নি তো?'

'না। আমি ওভারব্রিজে দাঁড়িয়েছিলাম। যাক, আগে এসে ভালই করেছ। কিন্তু এখন এখানে কী জন্যে এসেছ?'

'বাঃ, তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে আমি জানতাম।'

'এখানে তো রিকশাও দেখছি না, হেঁটে যেতে হবে তোমাকে।'

'হেঁটেই তো এসেছি।' অবন্তী বলল, 'কাল কখন?'

'আর বলো না। আমি প্রায় শনিবার ফাঁকি মারছি বলে অভিযোগ উঠেছে। কাল স্কুলে কিছু ছাত্রদের শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে হবে। কাটানো গেল না।'

'বিকেলের মধ্যে ফিরবে না?'

'বলতে পারছি না। বারো ভূতের ব্যাপার।'

অবন্তী চুপ করে গেল। তার খুব রাগ হচ্ছিল।

'রাগ কোরো না। রবিবার দুপুর দুটোয় স্টেশনে এসো, শক্তিগড় যাব।

'আমিও কোথাও যাব না।'

'আরে চাকরি করতে হলে কিছু কিছু আদেশ মানতেই হয়। রাগ করলে চলবে? শক্তিগড়ের হেডমিসট্রেসের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান রবিবার দুটোয় এসো।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে নটা বেজে গেল। মা গম্ভীর মুখে বসেছিল। সে অপরাধীর গলায় বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

মা জবাব দিল না।

শনিবারটা ভাইদের সঙ্গে কাটাল অবন্তী। হেমন্তর থেকে বসন্ত অনেক বেশি বুদ্ধিমান। অবন্তীর মনে হল ঠিক মতো গাইড করলে ছেলেটা অনেকটা ওপরে উঠবে ভবিষ্যতে। বিকেলবেলায় ওদের নিয়ে রাজবাড়ির দিকটা ঘুরে এল অবন্তী। ওরা খুব খুশি।

রবিবার মাকে বলল অবন্তী, 'আমি একটু শক্তিগড়ে যাব।'

আজ মা বেশ সহজ, 'কেন রে?'

'ওখানকার স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে লোক নেবে।'

'সে তো কয়েক মাসের জন্যে। তোর বাবা বলত, ঠিকে মাস্টার। পাকা সরকারি চাকরি ছেড়ে কেউ ঠিকে মাস্টারিতে যায় নাকি?'

'কতখানি ঠিকে, আদৌ পাকা হবে না কিনা জানবার জন্যে যাচ্ছি। শক্তিগড়ে চাকরি পেলে বাড়িতে থেকেই যাতায়াত করা যায়। অনেক পরিশ্রম আর টাকা বাঁচবে।' অবন্তী বলল।

মা তাকাল, 'খবরটা পেলি কোথায়?'

'স্বর্ণেন্দু দিয়েছে।'

'সে তো দেবেই।'

'তার মানে?'

'মাস্টাররা মনে করে মাস্টারির চেয়ে ভাল চাকরি আর নেই। তোর বাবাও তাই মনে করত। বলত, আমরা মানুষ গড়ার কারিগর। তা ওই কারিগরি করে কী লাভ হয়েছে? না, মেয়ের সামনে হাত পেতে থাকতে হচ্ছে।'

'আমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে একথা বলতে?'

'ছেলে চিরকাল ঘরে থাকবে। আর পাখা গজালেই মেয়ে পরের ঘরে যাওয়ার জন্যে মুখিয়ে থাকবে। দুজন এক হল?'

'আর ছেলে বিয়ে হলে পরের ঘরের পাখা গজানো মেয়ে যখন তোমার বাড়িতে এসে নিজের মতো তার স্বামীকে নিয়ে উড়তে চাইবে তখন সেটা সহ্য করতে পারবে? নাকি যে গোরু দুধ দেয় তার লাথিও মিষ্টি বলে ছেলের বউকে খাতির করবে? অবন্তী না বলে পারল না।

'সে যখন ছেলের বউ আসবে তখনই ভাবব। যাচ্ছ যাও, তবে এ ব্যাপারে আমার একটুও মত নেই। একজন গেছেন আর একজন সেই ভুল করুক আমি চাই না।' মা সামনে থেকে সরে গেল।

শক্তিগড় স্কুলের হেডমিসট্রেস বললেন, 'এর আগে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে আমরা অর্ডিনারি

অনার্স গ্র্যাজুয়েট নিয়েছি। কিন্তু তার জন্যে চাপ আসছে। মাস ছয়েকের জন্যে ছুটিতে গিয়েছেন একজন টিচার। তার জন্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে সুপারিশ আসছে। পার্টি থেকেও একজনকে নিতে বলা হয়েছে। ইনি যদি বি এড করে রাখতো তা হলে সুবিধে হত।'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'এর বাবাকে বোধহয় আপনি চিনতেন।'

'নিশ্চয়ই। কমলাকান্তবাবু শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন।'

'অন্তত একটা ইন্টারভিউ নেওয়া যেতে পারে না কি? ইন্টারভিউতে যে ভাল করবে তাকেই চাকরিটা দেবেন।'

ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন, 'আমার যাকে ভাল লাগল সেক্রেটারির তাকে হয়তো লাগল না। ঠিক আছে তুমি অ্যাপ্লাই করো।'

'চাকরিটা কি ঠিক ছয়মাসের জন্যে।'

'আপাতত। যিনি করতেন তিনি খুব অসুস্থ। ডাক্তাররা অসুখ ধরতে পারছে না। তাঁকে বোম্বে নিয়ে যাওয়া হবে। সাধারণ অসুখ হলে এত টাকা খরচ করে বোম্বে নিয়ে যাওয়া হয় না। যদি উনি সুস্থ না হন তা হলে আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে পার্মানেন্ট পোস্টের জন্যে। তখন যিনি ডেপুটেশনে ছিলেন তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যদি তাঁর পারফরমেন্স ভাল থাকে। ঠিক আছে?'

অবন্তী বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'কী করব?'

'দরখাস্তটা কাল যাওয়ার সময় আমাকে দিয়ে যেয়ো। যদি পার্টির ক্যান্ডিডেটকে শেষপর্যন্ত না নেয়া তা হলে—।'

'নিলে তো চুকে গেল। যদি আমাকে ছয়মাসের জন্যে করতে হয়—।'

'বোধহয় হবে না।'

'তার মানে?'

'ইনি বললেন না। আমি শুনেছি ভদ্রমহিলার ক্যানসার হয়েছে।'

'ও।' হঠাৎ একটা খারাপ লাগা তৈরি হয়ে গেল। সে পাকা চাকরি চাইছে। তার চাওয়াটা পূর্ণ হবে যদি সত্যি ভদ্রমহিলা ক্যানসারে মারা যান। হঠাৎ নিজেকে ছোট মনে হতে লাগল তার।

সে নিচু গলায় বলল, 'কারও সর্বনাশ কারও পৌষমাস।'

'জীবনের এটাই নিয়ম। একজন সরে যায় বলেই আর একজনের জায়গা হয়। এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না।'

স্টেশনে দাঁড়িয়ে ওরা চা খেল।

স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন চাকরি কেমন লাগছে?'

'প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেছে।'

'অফিসের কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হল?'

'নাঃ। আমি এড়িয়ে চলি।'

'কেন? তোমার সেই বলরাম?'

'লোকটা অদ্ভুত। মতলববাজ নয়।'

'কী করে বুঝলে?'

'মেয়েরা বুঝতে পারে।'

'তা হলে এত মেয়ে বোকা হয়ে যায় কেন?'

'বুঝেও বুঝতে চায় না বলে।'

'এই চাকরিটা হয়ে আর কোন সমস্যা থাকবে না। মা বলছিল তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কথা বলবে। আমি ওকে এখন যেতে নিষেধ করেছি। আগে চাকরিটা হোক।'

অবন্তী চোখ বন্ধ করল। মন ভাল হয়ে গেলে তার।

এখন এই বাড়িতে মা স্মৃতি হয়ে গেছে। ঠিক যেভাবে বাবা মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই স্মৃতি হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবে নয়। বাবার সম্পর্কে কথা বলার লোক বলতে মা ছাড়া কেউ ছিল না। ওঁর কথা শুনলে মনে হত বাবা অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিহীন মানুষ, মাকে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু মায়ের সম্পর্কে যে এখন অভিযোগের বন্যা বইছে এমনটি কি হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, বসন্ত বলতে পারে। নিজের অন্যায় কে মনে রাখে কিন্তু মা যে ওর বিয়ে মেনে নেয়নি, ও

বউকে এ বাড়িতে আনতে দেয়নি এই অভিযোগ বসন্ত করতেই পারে। হেমন্ত যে দিদির টাকায় দোকান খুলেছিল, সেই দোকানের আয়ের সঙ্গে দিদির পাঠানো টাকায় যখন সংসার চলেছে তখন এই সংসারে থাকার অধিকার বসন্তেরও ছিল, মা অন্যায়ভাবে তাকে বঞ্চিত করেছে। রত্নার মুখ খুলল পরের দিনই। এ বাড়ির বউ হয়ে এসে মায়ের কাছে কত যন্ত্রণা পেতে হয়েছে তাকে তার বর্ণনা শুনতে হয়েছে অবন্তীকে। শাশুড়ির হাতে সংসারের চাবিকাঠি, এমন কী দোকানের বিক্রিবাটার হিসেবও হেমন্তকে প্রতি রাত্রে মায়ের ঘরে গিয়ে দিয়ে আসতে হত। বাজারখচর থেকে রত্নার জামাকাপড় মায়ের অনুমতি ছাড়া কেনা যেত না। ঈষৎ প্রতিবাদ করলেই শুনতে হত, 'মুরোদ থাকলে নিজে রোজগার করে খরচ করো। আমার মেয়ের টাকায় ফূর্তি করা চলবে না।'

অবন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমি তো প্রতিমাসে আসতাম। আমাকে তোমরা বলনি কেন?'

'বললে ঘাড়ে মাথা থাকত? তোমার ভাই তো ওঁর সামনে কেঁচো।'

অবন্তী বলেছিল, 'ঠিক আছে। কিন্তু যে মানুষটা চলে গেছে তার আড়ালে এসব বলে লাভ কী? আজ বাদে কাল তার শ্রাদ্ধ। তোমাদের যদি তার সম্পর্কে শ্রদ্ধা না থাকে তা হলে শ্রাদ্ধ কোরো না।'

'ও মা, শ্রাদ্ধ করব না কি গো? মায়ের শ্রাদ্ধ না করলে পাড়ায় বাস করা যাবে? অনন্ত নরকবাস হবে।' রত্না বলেছির।

অবন্তী হেসে ফেলেছিল। এইসব কথা শোনার পর মনে হয়েছিল যার সবচেয়ে বেশি বলার ছিল নিজেদের কথা বলে তার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে এরা। তা ছাড়া মা বেঁচে থাকতে যখন সে কিছু বলেনি তখন আর কথা বলে কী লাভ?

হেমন্তকে ডাকল অবন্তী। হেমন্ত এলে বলল, 'বোস। তোর সঙ্গে কথা আছে। মায়ের শ্রাদ্ধ কীভাবে করবি?'

'কীভাবে করব মানে?' হেমন্ত অবাক।

'এখন লোকে দুভাবে করে। হয় মন্দিরে গিয়ে মূল্য ধরে দেয়, পুরুতমশাই দিনক্ষণ দেখে শ্রাদ্ধের কাজ করে দেন। নয়, আগে যেমন বাড়িতে সব হত তেমন। কোনটা করবি?'

'বাবার যেমন হয়েছিল তেমনই হওয়া উচিত।'

'উচিত! বাবার কেমন হয়েছিল মনে আছে তোর?'

'তা কী করে মনে থাকবে? আমি তখন খুব ছোট।'

'বাড়িতে হলে খরচ কত হবে?'

'শ্মশানযাত্রীদের নিয়ে শ'খানেক লোক খাবে। আর পুরুতমশাই যে লিস্ট দেবেন তা আনতে হবে। একটা প্যান্ডেল আর ডেকরেটার—।'

'কত?'

'মনে হয় হাজার পনেরোর মধ্যে হয়ে যাবে।'

'তুই কত দিতে পারবি?'

'আমি কোত্থেকে দেব? আমার দোকানের অবস্থা ভাল নয়। চাল ডাল দিতে পারি। সেটা কম নয়।'

'বড়জোর পাঁচশো তাই তো? বসন্ত দেবে বলে মনে হয় না।'

'তুমি চাপ দাও—!'

'তোকে চাপ দিলাম, তুই তো পাঁচশোর বেশি উঠলি না। অথচ তুই বড় ছেলে। মুখাগ্নি করেছিস, মাতৃদায় তোরও।'

এইসময় রত্না এসে দাঁড়াল দরজায়, 'দিদি, বুঝতেই পারছ—!'

'একশোজন লোককে খাওয়ানোর কী দরকার?'

'শ্মশানেই তো তিরিশজন গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন, পাড়ার লোকজন আছে। না খাওয়ালে বদনাম হবে।'

'আত্মীয়স্বজন কারা আছে জানি না। পাড়ার কাউকে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। যাঁরা মায়ের সঙ্গে কথা বলত তাদেরই বলো।'

রত্না বলল, 'এ কী বলছ দিদি! আমার বাপের বাড়ির লোকই বারোজন হবে। তাও দিদিদের শ্বশুরবাড়িকে বাদ দিচ্ছি। এরা তো আমাদের আত্মীয়স্বজন।'

'বুঝলাম। তা হলে টাকাটা আমাকে দিতে হবে?'

হেমন্ত রত্নাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বসন্ত নেই?'

'ওকে ডেকে কোনও লাভ হবে না।' অবন্তী বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেব। টাকাটার জন্যে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। াজ তিনরাত্রি শেষ হবে। কাল সকালে আমি যাব।'

ওরা বেরিয়ে গেলে মাটিতে চুপচাপ শুয়ে পড়ল অবন্তী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পেল ঘরে কেউ এসেছে। চোখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল, হাত না সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি।' খুব নিচু গলায় কাবেরী জবাব দিল।

উঠে বসল অবন্তী, 'কিছু বলবে?'

'আমার কিছু দেওয়া উচিত।' মাথা নিচু করল কাবেরী।

'কী ব্যাপারে?' অবাক হয়ে গেল অবন্তী।

'কাজের খরচ—।'

'তুমি কেন দেবে? উনি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তাতে তোমার কোনও দায় নেই।' অবন্তী বলল।

'হাজার হোক উনি আমার শাশুড়ি ছিলেন।'

'আচ্ছা! তোমার নিজের কিছু নেই, বসন্ত এক পয়সাও দেয় না, তুমি পাবে কোথায় যে দেবে?'

কাবেরী জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হল?'

'আমার দুটো কানের দুল আছে। চার আনা সোনার। আপনার ভাই জানে না। সেটা বিক্রি করে—!'

হঠাৎ অবন্তীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্না এল। এ বাড়িতে আসার পর সে একফোঁটা কাঁদেনি। এখন এই বাচ্চা মেয়েটার সামনে নিজেকে খুব ছোট মনে হল তার মা যখন ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন খবরটা সে পেয়েছিল। কোনওরকম মন্তব্য করেনি সে। বসন্তের ওপর রাগ ছিল, সেটা বেড়েছিল মাত্র। মনে হয়েছিল মা যা ভাল বুঝেছে, তাই করেছে, সে কেন নাক গলাবে এ সংসারে কোনও ব্যাপারেই সে কখনও কথা বলবে না। আজ এই মেয়েটা—।

অবন্তীকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল কাবেরী। সে কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'দিদি—।'

দুহাতে তাকে টেনে নিয়ে কাছে বসাল অবন্তী, 'শোন। আমি তোকে এক হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি। কাজের দিন তুই পাঁচশো বের করে ওদের দিবি। বলবি দিদি তোর মেয়ের মুখ দেখে ওটা দিয়ে গিয়েছে। বাকি পাঁচশো রেখে দিবি। তোর মেয়ে যেন কখনও না খেয়ে থাকে। আমার ঠিকানা দিচ্ছি, প্রয়োজনে জানাস। আর তোর ওই দুল আমি মেয়ের কানে দেখতে চাই। কক্ষনও বিক্রি করবি না।' সেই রাত শেষ রাত।

স্মৃতিরা যেন মারপিট করছে, কে সামনে আগে আসবে! শক্তিগত স্কুলের চাকরিটা তার হয়নি। ভাল ইন্টারভিউ দেওয়া সত্ত্বেও পার্টির ক্যান্ডিডেট চাকরিটা পেয়ে গেল।

চতুর্থ মাসে ঘটনাটা ঘটল। শুক্রবার স্টেশনে স্বর্ণেন্দু বলল, 'শোনো, তুমি বাড়িতে গিয়ে মাথা গরম করবে না।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'আমি নিষেধ করেছিলাম তবু মা তোমার বাড়িতে গিয়েছিল।'

'তারপর?'

'তোমার মা বলেছেন বাৎসরিক হওয়ার আগে তিনি মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেনই না। আর এই ব্যাপারটা জানা সত্ত্বেও কী করে আমার মা প্রস্তাব নিয়ে আসেন সেটা উনি ভেবে পাচ্ছেন না। আমি মাকে বলেছি, কথাটা অন্যায় নয়। গোঁড়া হিন্দুরা এসব নিয়ম মানে।'

অবন্তী বলেছিল, 'প্রথমটা বলে থেমে যাওয়া ঠিক ছিল না?'

'আসলে অনেকে কোথায় থামতে হবে জানে না।'

বাড়িতে ঢুকে খামটা মায়ের হাতে দিয়েছিল অবন্তী। মা খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করেছিল।

ঘৃণাক্ষরেও বলল না স্বর্ণেন্দুর মা এসেছিল। পরদিন দুপুরে খাওয়ার পরও মা কিছু বলছে না দেখে অবন্তী কথাটা তুলল। মা বলল, 'এর মধ্যেই খবর চলে গেছে তোর কানে? বাবা আমি তো ভাবতেই পারি না।'

'তুমি বলতেই পারতে বাৎসরিক না মিটলে তুমি রাজি নও। কিন্তু ওই সব কথা বলতে গেলে কেন?'

'কী কথা?'

'উনি কেন প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তুমি ভেবে পাচ্ছ না!'

'ঠিকই তো, অত বড় ধাড়ি মহিলার একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই? ছি ছি ছি। তা ছাড়া স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব কি না সেটা আগে ঠিক করা দরকার।' মা গরা তুলল।

'স্বর্ণেন্দু ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করা চলবে না।'

'বেশ তো কোরো না। কিন্তু এখন বিয়ে করা চলবে না।'

'আমরা একবছর অপেক্ষা করব।'

'একবছর? একবছরে তোর ভাইয়া কত বড় হবে? রোজগার করে আমাকে খাওয়াবে? লজ্জা করল না তোর কথাটা বলতে?'

'আশ্চর্য! আমি বিয়ে করলে তোমাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করব নাকি?'

'আমি কী করে বলব!' মা ঝট করে মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

'আমি কী করে বলব মানে? তুমি জানো না?' অবাক হয়ে গেল অবন্তী।

'সব জানা তো মিথ্যে হয় যাচ্ছে।'

'মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে?'

'না তো কী! তোকে অনেক আশা নিয়ে বড় করেছি। মানুষটা চলে গেলে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। যদ্দিন না এরা উপযুক্ত না হচ্ছে ভগবান তোর ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন। আর তুই বাপ মরতে না মরতেই নিজের কথা ভেবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পা বাড়িয়ে আছিস। মিথ্যে হচ্ছে না?'

'আমি তো বলেছি বাৎসরিকের আগে কিছু করব না। তদ্দিনে আমার চাকরি পার্মানেন্ট হয়ে যাবে।'

'তাতে আমাদের কী হবে?

'তার মানে?'

'তোর বাবা বলত ছেলে হয়নি তো কী হয়েছে, মেয়ে আমার ছেলের চেয়ে অনেক বেশি ভাল। এই তো ভালর নমুনা। বিয়ের খরচ কে দেবে?'

'আমরা সই করে বিয়ে করতে পারি।'

'বাঃ। আমার মুখ উজ্জ্বল হবে তাতে। তোর বাবার আত্মা খুব শান্তি পাবে। মুখের ওপর বলতে পারলি কথাটা?' চিৎকার করল মা।

অবন্তী বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, এখন যেভাবে তোমাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছি ওরা রোজগার শুরু না করা পর্যন্ত সেইভাবে দিয়ে যাব। বিয়ের জন্যে কোনও পরিবর্তন হবে না।'

'বিশ্বাস করি না।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

'না। শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার দু-একমাস পরে মেয়েদের কাছে বাপের বাড়ি দূর হয়ে যায়। তখন সেখানকার সমস্যাই বড় হয়ে যাবে। এই যে আমি এ বাড়িতে আসার পর কবার বাপের বাড়ি গিয়েছি? এসব ছেড়েছুড়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যেতে পারছি না কেন? তুইও পারবি না। যাকে বিয়ে করবি বলছিস সে তো আর লাখ লাখ টাকার মালিক নয়। স্কুল মাস্টারদের কত আয় তা আমি জানি। সেখানেও অভাব হাঁ করে বসে আছে। ফলে মাসে মাসে তোর দেওয়া টাকার পরিমাণ কমবে। একসময় বন্ধ করে দিবি। আর আমি ওই বাচ্চাদুটাকে নিয়ে না খেতে পেয়ে মরব। এই তুই চাস! কাঁদতে কাঁদতে মা সরে গেল সামনে থেকে। হতভম্ব হয়ে বসেছিল অবন্তী। মুখ ফিরিয়ে দেখল হেমন্ত দরজা ধরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই সব শুনেছে।

হেমন্ত এখনও বালক, ও ওভাবে তাকাচ্ছে কেন?

অবন্তী বলল, 'কিছু বলবি?'

'তুই চলে যাবি দিদি?' করুণ গলায় বলল হেমন্ত।

বাইরে থেকে মায়ের চিৎকার ভেসে এল, 'হ্যাঁ যাবে। কে তোর দিদি? ও তো রাক্ষুসী। নইলে নিজের সাধ মেটাতে আমাদের ভাসিয়ে যায়?'

অবন্তী উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এসব কী কথা বলছ?'

'ঠিকই বলছি।'

'আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা, মাইনের পুরো টাকা তোমাকে দেব। এর অন্যথা হবে না।'

'কেন আমাকে স্তোক দিচ্ছিস। বিয়ের পর বছর ঘুরতেই বাচ্চা হবে। তখন? তার খরচ হবে না? নিজের সন্তানের থেকে ভাইদের কেউ বড় করে দ্যাখে? বোঝাতে এসেছে আমাকে!' গজগজ করল মা।

'তুমি কী চাইছ?'

'আমি কী চাইব? দুটো অসহায় বাচ্চার বিধবা মায়ের কি চাওয়ার কোনও অধিকার আছে? আমাকে ভিক্ষে করতে হবে যদিন পারব নইলে সহ্য করতে না পারলে গলায় দড়ি দেব।'

'মা!' চিৎকার করে উঠল অবন্তী।

আচমকা ছুটে এল মা। অবন্তীর দুটো হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে কেঁদে ফেলল, 'তুই একটু অপেক্ষা কর, ওদের বড় হতে দে, তারপর তুই বিয়ে কর, আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোর বিয়ে দেব। এইটুকু ভিক্ষে দে আমাকে।'

অবন্তীর দুচোখ উপচে জল নামল। তার শরীর থর থর করে কাঁপছিল। মা বলে যাচ্ছিল, 'তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই রে। তুই যদি চলে যাস তা হলেই। ওঃ তোর তো এমন কিছু বয়স নয়, আর কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারবি না?'

হাত ছাড়িয়ে বিছানায় এসে উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরে কেঁদেছিল সে। মাথা কাজ করছিল না। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন কেউ আচমকা শুষে নিয়েছিল। তারপর যখন একটু বল এল তখন দেখল দুই ভাই তার পায়ের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হাফ প্যান্ট-পরা খালিগায়ের দুই বালক এবং শিশুর চোখে যে দৃষ্টি তা কোনওদিন ভুলতে পারবে না অবন্তী। কসাই-এর দিকেও মানুষ ওই চোখে তাকায় না।

সারাদিন আর বিছানা ছাড়েনি অবন্তী। নিজের সঙ্গে কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেল সে। মা যা বলছে তার অনেকটাই হয়তো সত্যি হবে। স্বর্ণেন্দুর বাড়িতে কোনও সমস্যা এলে সে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে কী করে? তারপর, সংসার বাড়লে—! কিন্তু বিয়ের পরও তো চাকরি করা মেয়েরা মা-বাবাকে সাহায্য করে যায়। সে তাই করত। অথচ মা বিশ্বাস করতে পারছে না। নিজেকে স্বার্থপর ভাবতে একটুও ইচ্ছে করছে না কিন্তু এ বাড়ির সবাই তাকে স্বার্থপর ছাড়া কিছু ভাবছে না।

দ্বিতীয় চিন্তা মাথায় এল। সে কলকাতায় আর স্বর্ণেন্দু বর্ধমানে, এই অবস্থায় বিয়ে করে লাভ কী? একসঙ্গে যখন থাকা যাবে না তখন শনি-রবিবারের জন্যে বিয়ে করার কোনও মানে হয় না। কথাটা আগেও সে স্বর্ণেন্দুকে বলেছে। কবে চাকরি একই শহরে হবে এই আশায় কি বসে থাকবে ওরা?

মা বলছে ভাইরা রোজগার শুরু করলে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেবে। সেটা কত বছর? অন্তত চৌদ্দো বছরের আগে হেমন্ত রোজগার করতে পারবে না। বসন্তর তো আরও দেরি হবে। ধরা যাক, পনেরো বছর। পনেরো বছর বাদে তার বয়স সাঁইত্রিশ হয়ে যাবে, স্বর্ণেন্দুর চল্লিশ পেরোবে। অসম্ভব। সাঁইত্রিশ বছরে কোনও কোনও মেয়ের বিয়ে হয় কিন্তু সে স্বর্ণেন্দুকে চল্লিশ পার হয়ে অপেক্ষা করতে কোন মুখে বলবে? সেই রাত অবন্তীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত। বুকের ভেতর থেকে সমস্ত স্বপ্ন একটু একটু করে তুলে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে যে কী নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় তা সেই রাতের আগে জানা ছিল না তার।

ভোর হতে না হতেই একটা রিকশা নিয়ে বেরিয়ে গেল অবন্তী। দরজা খুললেন স্বর্ণেন্দুর মা, 'আরে তুমি?'

'একটু এলাম।' গম্ভীর গলায় বলল অবন্তী।

'এসো এসো। চা বসিয়েছি, ঠিক সময়ে এসেছ।'

ভালা শুনে স্বর্ণেন্দু বেরিয়ে এল বাইরের ঘরে, 'কী ব্যাপার? আজ অফিস ডুব মারছ নাকি?'

'কেন?'

'এরকম সারপ্রাইজ দিলে। এখন তো তোমার সাপ্তাহিক অফিস করার জন্যে তৈরি হওয়ার সময়। নিশ্চয়ই কোনও সমস্যা হয়েছে। আমি তোমাকে মাথা গরম না করতে অনুরোধ করেছিলাম।' স্বর্ণেন্দু বলল।

'আমি একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় এসেছি।'

স্বর্ণেন্দুর মা বললেন, 'তুই যা স্বর্ণ, মুখ ধুয়ে আয় চা হয়ে গেছে।'

যতক্ষণ চা না আসছিল, একা ঘরে বসে অবন্তী ভাবছিল কীভাবে কথাগুলো বলা যায়? কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়া কথা বলা খুব মুশকিল, কিন্তু তাকে বলতেই হবে। চা নিয়ে এলেন স্বর্ণেন্দুর, মা, সঙ্গে বিস্কুট। স্বর্ণেন্দুও এল। তিনজনেই চা খাচ্ছিল। স্বর্ণেন্দুর মা বললেন, 'তোমার মায়ের কথায় আমি কিন্তু রাগ করিনি। এত তাড়াতাড়ি যাওয়া আমার ঠিক হয়নি।'

'আমি নিষেধ করেছিলাম।' স্বর্ণেন্দু বলল।

'আসলে আমার ওপর সবাই চাপ দিচ্ছে। অনেকদিন চাকরি করছে স্বর্ণ, আমি কেন বিয়ে দিচ্ছি না। আমার এক মাসি, স্বর্ণকে খুব ভালবাসেন, তিনি তো রাগ করে চিঠি দিয়েছেন। তাই—!'

'উনি নিশ্চয়ই আরও একবছর বাঁচবেন।'

অবন্তী সোজা হয়ে বসল, 'আপনাদের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।'

দুজনেই মুখ তুলে তাকাল।

অবন্তী বলল, 'কথাটা তোমাকে আলাদা বলা উচিত ছিল। কিন্তু নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারলাম না। উনি আমাদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ। তাই—!'

স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কী কথা?'

অবন্তী বলল, 'আমাদের আর সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমার পক্ষে আগামী পনেরো বছরের মধ্যে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

স্বর্ণেন্দুর মায়ের গলা থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ বের হল, 'কী বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ। আমার দুই ভাই নেহাতই নাবালক। ওরা রোজগার শুরু না করা পর্যন্ত আমি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না।'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'আমি তোমাকে কখনও সেটা করতে বলেছি?'

'না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। আপনি বুঝবেন। আমি আর ও একই শহরে কবে চাকরি করতে পারব তা দুজনের কেউ জানি না। যা রোজগার করি তা যেটুকু নিজের জন্যে না রাখলে নয় তাই রেখে বাকিটা মায়ের হাতে দিই। তাতে খুব কষ্টে ওদের চলে যায়। মা যদি ভয় পায় বিয়ের পর আমি টাকার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দেব তা হলে ওঁকে দোষ দিতে পারি না। অথচ নিচের খরচ বেড়ে যাবে। বলুন ঠিক কিনা?' কাতর চোখে তাকাল অবন্তী।

স্বর্ণেন্দুর মা বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা আমি ভেবেছি। তোমার পক্ষে চাকরি ছাড়া সম্ভব নয়। আবার একসঙ্গে বাস না করলে বিয়ে করার কোনও অর্থ নেই।'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'এই বর্ধমানেই ওর চাকরি হয়ে যেতে পারে।'

অবন্তী বলল, 'সেটা অনিশ্চিত।'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'বেঁচে থাকাটাও তো তাই।'

অবন্তী বলল, 'আবেগসর্বস্ব কথা বলে কোনও লাভ নেই।'

স্বর্ণেন্দুর মা বললেন, 'তোমার মা পনেরো বছর পরে বিয়ের কথা বলেছেন? সে তো অনেক সময়। তদ্দিন আমি বাঁচব না।'

'সেই কারণেই আমি ওকে বলছি আমার জন্যে অপেক্ষা না করতে।'

'কিন্তু পনেরো বছর পরে তোমার কী হবে?'

'তুমি কি তোমার মাকে কথা দিয়েছ?' স্বর্ণেন্দুর মা জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। এ ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না।'

'তুমি কি করে আশা করলে স্বর্ণ তোমার জন্যে পনেরো বছর অপেক্ষা করবে? এটা কি বাস্তবসম্মত কথা?'

'আমি তো আশা করিনি। ওকে বলিওনি অপেক্ষা করতে।'

'কী আর হবে। চাকরি করব।'

'নিজের সংসার?'

'মাসিমা, পনেরো বছর অনেকটা সময়। তদ্দিনে মনের কী অবস্থা হবে তা এখন বলব কী করে?'

স্বর্ণেন্দুর মা বললেন, 'এই যদি অবস্থা হয় তা হলে আমি তোমার কথা মেনে না নিয়ে আর কী করতে পারি। এক-দুবছর অপেক্ষা করা যায়। কিন্তু পনেরো বছর—!'

স্বর্ণেন্দু বলল, 'মা আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

স্বর্ণেন্দুর মা বললেন, 'তুই আর নতুন কী ভাববি? অবন্তীর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে না রেখে ও বাড়িতে এসে সামনাসামনি আলোচনা করল।'

অবন্তী উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে ক্ষমা করো।'

'এসব কথা উঠছে কেন?' স্বর্ণেন্দুর উত্তেজিত হল, 'একটা সাধারণ ব্যাপারকে বড় করা হচ্ছে অকারণে। আমি তোর মায়ের কাছে গিয়ে লিখে দিচ্ছি যদ্দিন বেঁচে থাকব তোমার মাইনের একটা টাকাও আমরা নেব না।'

'তাতে কি সুরাহা হবে?'

'উনি নিশ্চিন্ত হবেন।'

'হবেন না। তা ছাড়া বিয়ের পর প্রতিটি মুহূর্তে ও বাড়ির কথা চিন্তা করলে আমি ভাল থাকব না। মাসিমা চান তোমার বিয়ে দিতে। তুমি ওঁর ইচ্ছে পূর্ণ করো। সেটা আমারও ইচ্ছে।' অবন্তী বলল।

'তুমি হঠাৎ এমন বদলে গেলে কী করে!' স্বর্ণেন্দু কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

অবন্তী হাসল, 'আর একটা কথা। আগেই বলেছি নিজের প্রতি আস্থা খুব কম। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করোনা না!'

অবাক হয়ে তাকাল স্বর্ণেন্দু।

'তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি দুর্বল হয়ে যাব।' অবন্তী পা বাড়াল। স্বর্ণেন্দুর মা বললেন, 'ও ঠিক বলেছে স্বর্ণ। ওকে নিজের মতো থাকতে দেওয়া উচিত তোর।'

স্বর্ণেন্দু চিৎকার করল, 'এগুলো নেহাতই বোকামি। অর্থহীন। তুমি কি ভাবছ নিজেকে এভাবে উৎসর্গ করলে লোক তোমাকে হাততালি দেবে? কেউ দেবে না। কেউ মনে রাখবে না।'

'উৎসর্গ করেছি কে বলল? তোমাকে বিয়ে করার পর যে কখনও মতান্তর হত না তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? আমার ভাইরা যদি নিয়মিত তাদের অভাবের হাত নিয়ে তোমার কাছে আসে কতদিন সহ্য করবে তুমি? এখন যে উদারতা মনে আসছে তা যদি শেষ পর্যন্ত না থাকে? এই ইস্যু নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদি নষ্ট হয়? আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি না নিজেকে বাঁচাতে চাইছি। এলাম।' অবন্তী বেরিয়ে এল। হঠাৎ দুটো পা যেন লোহা হয়ে গেল। মাথা ঘুরছে, দৃষ্টি অস্বচ্ছ। কোনওমতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে রিকশা খুজল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তার। প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করতে চেষ্টা করছিল অবন্তী। এ ছাড়া যখন কোনও উপায় নেই তখন ঠিক কাজ করে এসেছে সে। হাত তুলে রিকশা দাঁড় করালেন অবন্তী। সেটায় উঠতে কষ্ট হচ্ছিল।

'কোথায় যাবেন?'

'কোনও ফাঁকা রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াও।'

লোকটা কী বুঝল সে-ই জানে, প্যাডেল ঘোরাল। শরীর এলিয়ে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসেছিল সে। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। কপালে জমে যাওয়া ঘামে সেই হাওয়া আরাম আনছে। 'দিদি, কোন দিকে যাব?' প্রশ্ন শুনে চোখ খুলল অবন্তী। রিকশা যাচ্ছে একটা বিরাট দিঘির পাশ দিয়ে। দিঘিতে পদ্মপাতা পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল। 'পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে/পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।' অবন্তী বলল, 'বাড়ি চলো।'

বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছিল স্বর্ণেন্দু, জবাব দেয়নি অবন্তী। জবাব না দেওয়ার জন্যে প্রচণ্ড চাপ জমত বুকে। মনে হত সত্যি কথাটা লিখে জানাই। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার প্রথম ভালবাসা। তোমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকার কথা ভাবলেই শরীর হিম হয়ে যায়। কিন্তু লিখতে পারেনি। বাস্তব বড় কঠিন। আবেগ সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে। এই কষ্ট, যত তীব্রই হোক, সহ্য করতে করতে একসময় অভ্যেসে এসে যাবে।

কাউকে কিছু না বললেও অশোকাদির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল সে। এক সন্ধেবেলায় যখন সে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে তখন অশোকাদি এসে পাশে বসলেন, 'কী হয়েছে বল তো?'

'কিছু না।'

'কিছু তো হয়েছে। আর এটা মেয়েদেরই হয়।'

'মানে?'

'পুরুষদের কিছু হলে তাকে চাপা দেওয়ার অনেক পথ খোলা থাকে। বন্ধুবান্ধব, সিনেমা থিয়েটার দেখে তারা ভুলে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েরা গুমরে মরে। যত গুমরায় তত তাদের সর্বনাশ এগিয়ে আসে।'

এরকম কথা শুনলে মুখোশ পরে থাকা যায় না। অশোকাদিকে সব কথা খুলে বলল অবন্তী। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন অশোকাদি, তারপর বললেন, 'এক্ষেত্রে কপাল ছাড়া আর কাকে দায়ী করবি? তোর মা বাড়াবাড়ি করছে কিন্তু তাঁর কথা চিন্তা করলে মনে হবে ভয় তিনি পেতেই পারেন। স্বর্ণেন্দু খুব ভদ্রছেলে। সে তো চাইবেই বিয়েটা হোক এবং তোকে কোনও বাধা দেবে না। তবে তোর মায়ের কথাও ঠিক, ভবিষ্যৎ কে বলতে পারে। স্বর্ণেন্দুর মা তো স্বাভাবিকভাবেই আশা করবেন তাঁর ছেলের তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে। আবার তোর দুজন দু-জায়গায় থেকে বিয়ে করে কতদিন আলাদা থাকবি? অনেকেই শুনেছি আজকাল ওরকম থাকে। ওটা আর যাই হোক সংসার করা নয়। তুই ঠিকই করেছিস। পনেরো বছর কাউকে অপেক্ষা করতে বলা স্বার্থপরতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখানো। তুই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিস সেটা কাম্য না হলেও এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই রে। এখন তোর অল্প বয়স। জীবন তোকে কী দেবে তা তুই জানিস না। হয়তো ভাল হবে কিন্তু এর চেয়ে তো খারাপ হবে না। তুই নিজের কথা ভাবছিস, স্বর্ণেন্দুর কথাটা ভাব। ওই চিঠির উত্তর দেয়া মানে আবার সম্পর্ক তৈরি করা। ওকে সংসারী করার জন্যে তোর নির্মম হওয়া উচিত।

'আমি কী করব?

'কেন? চাকরি করবি। সিনেমা থিয়েটার দেখবি। বই পড়বি। আর তাতে যদি সময় না কাটে তা হলে গান শেখ, আবৃত্তি কর। এখন তো এসবের নানান স্কুল হয়েছে। একবার জড়িয়ে গেলে দেখবি চমৎকার সময় কেটে যাবে।'

পরদিনই অফিসে কাণ্ডটা হল। অফিসের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হবে মহাজাতিসদনে। গানবাজানার অনুষ্ঠান। নামী শিল্পীরা আসবেন। কিন্তু অফিসের স্টাফরা একটা ছোট অনুষ্ঠান করতে চান। হয় বিদায় অভিশাপ নয় কর্ণকুন্তী সংবাদ। রিক্রিয়েশন ক্লাবের কর্মকর্তারা সোজা চলে এল অবন্তীর কাছে। একজন বলল, 'আপনি নতুন এসেছেন। আপনাকে করতে হবে।'

অবন্তী চোখ কপালে তুলল, 'আমি যে কখনও করিনি।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'আপনার গলার স্বর সুন্দর, ঠিক পারবেন।'

'বিশ্বাস করুন!'

'সেটা করব রিহার্সাল দেখার পর। কোনটে করব ঠিক করে নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেব। কাল থেকে রিহার্সাল।'

ওরা চলে গেলে মিস্টার সেন বললেন, 'ভালই তো। শুধু অফিস আর বাড়ি করলে কি বেঁচে থাকা যায়?'

বাড়িতে ফিরে অশোকাদিকে খবরটা দিলে তিনি উৎসাহ দিলেন, 'একেবারে না বলবি না। রাজি হয়ে যা। মন ভাল হয়ে যাবে।'

'বিদায় অভিশাপ' বহুবার পড়া। অনেক লাইন মুখস্থ। রিহার্সালেই হাততালি পড়ল। সবাই বলল, 'আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। কখনও না করলে এইভাবে বলা যায় না।'

সাতটা পর্যন্ত রিহার্সাল হত। তখন অফিসপাড়া ফাঁকা বলে একজন তাকে ট্রামে তুলে দিতে

আসত। সেদিন অফিস থেকে বেরুতেই স্বর্ণেন্দুকে দেখতে পেল অবন্তী। দেখেই শরীর কীরকম হয়ে গেল। নার্ভগুলো দপদপ করছিল। কী করবে সে? কথা বলবে? সঙ্গে যে ছেলেটা তাকে পৌঁছে দিতে চলেছে সে বকবক করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ অবন্তী দাঁড়িয়ে গেল। গলা তুলে বলল, 'কী ব্যাপার? এখানে?'

এরকম প্রশ্ন স্বর্ণেন্দু আশা করেনি। কথা খুঁজে না পেয়ে হাসল সে।

অবন্তী ছেলেটিকে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ইনি আমার পরিচিত, ওর সঙ্গে যাচ্ছি।'

ছেলেটি স্বর্ণেন্দুর দিকে একবার তাকিয়ে ফিরে গেল। অবন্তী বুঝল আজই এ নিয়ে গল্প তৈরি হবে।

'আমি গতকালও ফিরে গেছি ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে।' স্বর্ণেন্দু বলল।

'কিন্তু তার তো কোনও কথা ছিল না।' অবন্তী হাঁটতে লাগল।

'আমি অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলাম।'

'জানি।'

'তুমি একটারও জবাব দাওনি।'

'ঠিকই।'

'কেন?'

'জবাব দেওয়ার তো কিছু নেই।'

'অবন্তী!'

'শোনো, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে দেখা কোরো না।'

'কেন?'

'আমি চাই না আমাকে নিয়ে কোনও গল্প তৈরি হোক। আমি এখানে একা থাকি। একা যেসব মেয়েরা থাকে তাদের সমস্যা অনেক।'

'কিন্তু আমার সঙ্গেই তো তুমি প্রথম এই অফিসে এসেছিলে!'

'সেটা অতীত, কেউ মনে রাখবে না।'

'কেউ না রাখুক, তুমি যে রাখছ না তা বুঝতে পারছি।'

'বেশ, তাই। আমি তোমার কাছে আবেদন করেছিলাম যে আমাকে দুর্বল করে দিয়ো না। তবু তুমি—!'

'অবন্তী। আমি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসতে পারি। এখানকার একটা কাগজে সাব এডিটারের চাকরি হতে পারে।'

'তারপর?'

'আর তো কোনও সমস্যা থাকবে না!'

'তোমার মা রাজি আছে?'

'রাজি করাতে হবে। তবে কলকাতায় খরচ বেশি, বড় ফ্ল্যাট নেওয়া যাবে না। কাগজটা মাঝারি, বেশি মাইনে পাওয়া যাবে না। তাই মাকে এখনই নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।'

'তুমি স্কুলে যা পাও তার চেয়ে কম পাবে?'

'হ্যাঁ।'

'স্বর্ণেন্দু!' ঘুরে দাঁড়াল অবন্তী, 'তুমি আত্মহত্যা করতে চাও?'

'মানে?'

'কলকাতা বড় নির্মম জায়গা। আমি একটা পয়সাও দিতে পারব না। অভাবের হাঁ মুখ চারপাশে থাকলে আর যাই হোক সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে না। আমি এটা চাই না স্বর্ণেন্দু।'

'চমৎকার। একেবারে কলকাতার মানুষের মতো কথা বলছ।'

'কলকাতার মানুষ?'

'হ্যাঁ! যার স্বার্থ ছাড়া এক পা-ও চলে না।'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'তুমি এত রাত পর্যন্ত অফিসে কী করছ? ওভারটাইম?'

'না। রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।'

'রিহার্সাল? কীসের?'

'অফিসের নাটকের।'

'বাঃ, বেশ ভালই আছ দেখছি।'

'তুমি আর কিছু বলবে?'

'তোমার তো শোনার আগ্রহ নেই।'

'অনাবশ্যক বিদ্রূপ সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'এই ছেলেটি কে?'

'কোন ছেলে?'

'যে তোমার সঙ্গে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে যাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলে? ও কি রোজ তোমার সঙ্গে যায়?'

অবন্তী হেসে ফেলল, 'এবার তুমি পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছ। আর সেটা করতে গিয়ে তুমি নিজেকে নীচে নামিয়ে ফেলছ। তোমার সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা আছে। দয়া করে সেটাকে নষ্ট কোরো না।'

অবন্তী কথা শেষ করে এগিয়ে গিয়ে ট্রাম স্টপে দাঁড়াল। সে পেছন ফিরে তাকায়নি। খুব ইচ্ছে হলেও মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল। ট্রাম আসতেই উঠে পেছনের সিটে বসে পড়ল। ফাঁকা ট্রাম। হঠাৎ খুব কান্না পেল তার। স্বর্ণেন্দু এই ভাষায় কখনও কথা বলেনি।

সেই শেষ। আর কখনও স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রতি মাসে বর্ধমানে গিয়েছে সে রুটিনমতো কিন্তু কখনও স্বর্ণেন্দু তার সামনে এসে দাঁড়ায়নি। প্রথমদিকে মায়ে মুখ দেখে সে বুঝতে পারত উদ্বেগে আছে। হয়তো তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে স্বর্ণেন্দুর। তারপর একদিন বলল, 'শুনেছিস তো?'

'কি?'

'স্বর্ণেন্দু স্কুলের চাকরি ছেড়ে গুসকরায় চলে গেছে। ওখানকার স্কুলে চাকরি নিয়েছে। তোর বাবার এক বন্ধু এসেছিলেন, তিনি বললেন।'

মাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। চুপচাপ শুনে গিয়েছিল অবন্তী। অসাড় হয়ে গেলে নতুন আঘাত কোনও গুরুত্ব পায় না।

সে-সময় যদি অশোকাদি পাশে এসে না দাঁড়াতেন তা হলে কী হত কে জানে স্বর্ণেন্দুর খবর আর পাওয়া যাচ্ছিল না। ক্রমশ নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। অশোকাদি অনেক বুঝিয়ে সেই সময় মনটাকে পাল্টে ফেলতে সাহায্য করলেন। একটু একটু করে নিজেই বুঝতে পারছিল তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এদিকে অফিসের অনুষ্ঠানে 'বিদায় অভিশাপে' দেবযানী করে অবন্তী প্রচারিত হয়ে গেছে। বিপুল হাততালি পড়েছিল সেই সন্ধ্যায়। রাত্রে অশোকাদি বলেছিল, 'তুই দারুণ বললি, মনে হচ্ছিল সত্যিকারের দেবযানী।'

তার দুদিন পরে এক ভদ্রলোক হাজির হলেন অফিসে তাদের কালচারাল সেক্রেটারির সঙ্গে। ভদ্রলোক পেশাদারি নৃত্যনাট্য প্রয়োজনা করেন। শাপমোচন হচ্ছে। সেদিনকার অনুষ্ঠান তিনি শুনেছেন। অবন্তীকে কমলিকার ভূমিকায় মঞ্চের বাইরে থেকে কণ্ঠ দিতে হবে। রাজার ভূমিকায় করছেন বিখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ। কালচারাল সেক্রেটারি বললেন, 'এই সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনি না বলবেন না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা এখন বেশি টাকা দিতে পারব না। বিজ্ঞাপনে নাম থাকবে আর সামান্য সম্মান দক্ষিণা।'

অবন্তী মাথা নেড়েছিল, 'আমি পারব না।'

'আপনি অত সুন্দর দেবযানী বললেন আর কমলিকা পারবেন না? তা কি হয়?' ভদ্রলোক হাসলেন।

'আমি একটু ভেবে দেখি।'

ওরা চলে গেলে মিস্টার সেন বললেন, 'অফিসের কাজ ঠিকঠাক চালিয়ে যদি ওসব করো তা হলে ক্ষতি কী? তবে মুশকিল একটাই—!'

অবন্তী তাকিয়েছিল।

'এই সব রঙিন জগতে একবার ঢুকলে নানান হাতছানির সামনে পড়তে হয়। কার মনে কী মতলব আছে বোঝা মুশকিল।'

'রঙিন জগৎ?'

'সিনেমার মতো নয় বটে কিন্তু বিখ্যাত গায়ক গায়িকা গাইবেন, প্রায়ই নামী প্রেক্ষাগৃহে ফাংশন হবে, বুঝতেই পারছ।'

অথচ রাত্রে অশোকাদি অন্য কথা বলল, 'তুমি ঘুষ নিতে পারবি?'

'এম্মা, কী বলছ!'

'তুই তোর মাকে বলেছিস নিজের জন্যে সামান্য রেখে মাইনের বাকি টাকাটা বর্তমানে দিয়ে দিবি। তাই তো?'

'তো?'

'ফস্ করে একটা বড় অসুখ হল, টাকা কে দেবে তোকে? নিজের জন্যে জমাতে পারবি? তুই নতুন বলে ওরা কম দেবে, কিন্তু যাই দিক সেটা তো তুই নিজের জন্য রাখতে পারবি! তোর এই এক্সটা ইনকাম তোরই।'

'কিন্তু যদি খারাপ হয়?'

'বাড়িতে রিহার্সাল দে, খারাপ হবে না। দেখবি দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছে।'

'মিস্টার সেন বললেন নানান হাতছানি, মতলববাজ লোকজন!'

'তাতে তোর কী?'

'বাঃ তেমন হলে আমি কী করব?'

'দ্যাখ, বিপদে পড়ে অতি সরল, একেবারে হাবা মেয়েরা তুই কি তেমন মেয়ে নাকি? আর পড়ে যার লোভী। যাদের লোভ দেখিয়ে পুরুষগুলো নরকে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, তুই যদি ঠিক করে নিস কখনও লোভ করবি না তা হলে তোর ভয় নেই।' অশোকাদি বুঝিয়েছিল।

ভদ্রলোক আবার আসলে সম্মতি জানিয়েছিল অবন্তী।

প্রথম দিনে রিহার্সালে অশোকাদিকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল অবন্তী। একই সঙ্গে নাচ গান আর সংলাপ। গানের শিল্পীদের বদলে রেকর্ড বাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানের দিন নামী শিল্পীরা সরাসরি গাইবেন। প্রদীপ ঘোষকে প্রণাম করে অবন্তী বলেছিল, 'আমি কিছু জানি না, এঁরা বলেছেন বলে এসেছি। আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন!'

প্রদীপ ঘোষ বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই। অসুবিধে হলে বলবেন। আপনি নিয়মিত আবৃত্তি করেন?'

'না।'

ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনের রিহার্সালের পর তিনি বলেছিলেন, 'চমৎকার গলা। এবার ঘষামাজা করা দরকার।'

'কীভাবে করব?'

'মানে বুঝে বাড়িতে প্র্যাকটিশ করুন। হার্মোনিয়েম বাজিয়ে গলা সাধুন। আপনার হবে।' আপ্লুত হয়েছিল অবন্তী। তারপর সকালে সন্ধ্যায় একা থাকলেই কবিতা নিয়ে বসে যেত। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ। প্রথম অনুষ্ঠানে প্রশংসা পেল সে, সঙ্গে একশো টাকার একটা খাম। পেয়েই মনে হল অনেক কিছু কিনতে হবে। প্রথমেই একটা চটি। যেটা পরে আছে সেটা অনেকবার সেলাই করা হয়ে গেছে।

জীবনে একটু বৈচিত্র হল। অফিস বাড়ি আর প্রতিমাসের প্রথম শনিবারে বর্তমানে গিয়ে মায়ের অনুযোগ শোনার বাইরে যে জীবনের স্বাদ আকস্মিক এসেছিল সেটাই যেন তাকে বাঁচিয়ে দিল। এখন প্রায় কাগজে নাম বের হয় তার। রেডিয়োতে যারা বিজ্ঞাপন করেন তাঁদের কাছ থেকেও ডাক এসেছে। সরকারি চাকুরি হিসেবে সে অন্যত্র কাজ করে টাকা নিতে পারে, সই করে। ফলে অনেক ডাকে সাড়া দিতে পারে না অবন্তী। অফিসে আবেদন করেছিল। তারা জানিয়েছে যে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম সে করতে পারে কিন্তু পেশাদারি শিল্পী হিসেবে নয়। অতএব যারা সই না করিয়ে টাকা দেবে তারা কম দেওয়ার সুযোগ নেবেই। যেখানে চেক-এর ব্যবস্থা সেখানে যাওয়ার প্রশ্ন নেই।

এরমধ্যে কয়েকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। অশোকাদির সাহায্যে সে সরকারি মহিলা হোস্টেলে জায়গা পেয়েছে। অশোকাদিও সঙ্গে আছেন। বিপাশা করে এম-এ পরীক্ষা দিতে তার দেশে চলে

গেছে। প্রথম প্রথম চিঠি দিত। এখন আর যোগাযোগ নেই। শেষ খবর এসেছিল বিয়ের কার্ডে। পেয়িংগেস্ট থেকে হোস্টেলের বাসিন্দা হওয়ার মুহূর্তে ওদের মালিকানকে খুব নরম দেখিয়েছিল। এত ভাল বোর্ডার তিনি আর পাবেন না বলে হা-হুতাশ করেছিলেন। অশোকাদিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমরা বলেছিলে ওই একলা ঘরে কেউ বেশিদিন থাকে না। কেন বলেছিলে গো?'

অশোকাদি বলেছিলেন, 'ছেড়ে দাও। তুমি তো থাকলে!'

'নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল!'

'তোমাকে কোনও অভিজ্ঞতার সামনে আসতে হয়নি?'

'কীরকম?'

'রাত্রে মালিকান তাঁর ঘরের দরজা খুলে তোমার সঙ্গে গল্প করতে কখনও আসেননি?' অশোকাদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তো!' অবাক হয়েছিল অবন্তী।

'মানুষের তো পরিবর্তন হয়।'

'তার মানে?'

'ওই মহিলা যখন খুব একা বোধ করতেন তখন ওই ঘরে যেতেন। তোমার আগে যারা ছিল তাদের ছিল ছোটখাটো। উনি নাকি তাদের সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করতেন।'

'যাঃ! মেয়েতে মেয়েতে প্রেম কি!'

'কখনও কখনও হয়। ছেলেতে ছেলেতে, মেয়েতে মেয়েতে, বিদেশে নাকি এটা স্বাভাবিকের পর্যায়ে চলে এসেছে। ওইসব মেয়েরা মেনে নিতে পারেনি বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত মালিকানের চৈতন্য ফিরে এসেছিল বলে তোমাকে বিরক্ত করেনি আর।'

'উনি বিয়ে করেননি কেন? যদি প্রেম থাকে তা হলে সেটা কোনও পুরুষকে দেওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল।'

'আমাকে বলতেন, ছেলেদের উনি বিশ্বাস করেন না। হয়তো প্রথম জীবনে তেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার জের সারাজীবন কাটেনি।' অশোকাদি হেসেছিলেন।

নতুন হোস্টেলেও কিছু নিয়মকানুন আছে কিন্তু স্বাধীনতা অনেক। অবন্তী আর অশোকাদি একটা ঘর পেয়েছিল। খাওয়াদাওয়া খারাপ নয়। জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে ঠিক সেইভাবে বেড়েছে হোস্টেলের করচ। পে-কমিশনের রিপোর্ট থেকে পাওয়া বাড়তি মাইনে অবন্তীকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল! তা চাড়া অফিসের পরীক্ষা দিয়ে একটা প্রমোশনও হয়ে গিয়েছিল তার। মাইনে বেড়েছিল।

কিন্তু উৎপাত শুরু হয়েছিল। অফিসের পথে ট্রাম স্টপে এক ভদ্রলোক নিয়ম করে দাঁড়াতে লাগলেন। পেছন পেছন আসতেন। তারপর গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাইলেন।

অবন্তী জিজ্ঞাস করল, 'আলাপ করে কী লাভ হবে আপনার?'

'বাঃ, মানুষে সঙ্গে মানুষের আলাপ হওয়া কি অন্যায়?'

'মোটেই নয়। তা হলে এই রাস্তা দিয়ে যে কজন মানুষ যাচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আপনি আলাপ করুন।'

ভদ্রলোক বলেই দ্বিতীয়বার আর কথা বলতে আসেনি।

যে ভদ্রলোক প্রায়ই অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে আসতেন তাঁর হাবভাব এমন হয়ে গেল যে মনে হবে তিনিই অবন্তীর গার্জেন। এই কোরো না, ওই কোরো না, বিজ্ঞাপনে তোমার নাম বড় টাইপে দিয়েছি ইত্যাদি বলে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতেন। প্রায়ই বলতেন, 'বাইরে ফাংশন পেলে যেতে হবে কিন্তু। দিল্লিতে পুজোর সময় একটা চান্স আছে। তখন না বোলো না।'

অবন্তী লক্ষ করেছিল, এইসব মানুষেরা একটু আলাপ হতেই তুমি বলতে শুরু করেন। খারাপ লাগলেও আপত্তি করেননি সে। কিন্তু ওই প্রস্তাবে মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কেন নয়?'

'ওইসময় আমাকে বাড়ি যেতে হবে।'

'আরো কয়েকদিনের মামলা। ওখান থেকে আমি তোমাকে আগ্রা ঘুরিয়ে আনব। লক্ষ্মীপূজোর রাত্রে তাজমহল দারুণ।

'এত কষ্ট করবেন কেন?'

'আরে এটা কষ্ট নাকি? তোমার জন্য সব করতে পারি।'

'কেন?'

'তুমি বোঝ না?'

'না।'

'আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি অবন্তী।'

'কী আশ্চর্য মিল।'

'মিল মানে?'

'আপনার আগে অন্তত পাঁচজন এই একই কথা বলেছেন।'

'কারা?'

'আপনারই পরিচিত শিল্পী অথবা আয়োজক।'

'তুমি কী জবাব দিয়েছ?'

'আপনাকে যা দিলাম।'

'তুমি তো কোনও জবাব দাওনি।'

'মুখে বলতে হবে? দেখুন, এরপর যদি মনে হয় আমাকে কোনও অনুষ্ঠানে ডাকবেন না তা হলে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হব না। ঠিক আছে?'

সত্যি-সত্যি অনুষ্ঠানের ডাক আসা কমে গেল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল আর একটা যোগাযোগ। বছর খানেক আগে আকাশবাণীতে ঘোষকের জন্য আবেনপত্র চাওয়া হয়েছিল। হবে না জেনে একটা পাঠিয়েছিল অবন্তী। তার পরীক্ষাগুলোতে পাশ করে গেল সে। এবার ইন্টারভিউ।

অশোকাদি বলেছিলেন 'তোর হয়ে যাবে। কিন্তু আকাশবাণীর কাউকে বলবি না ইন্টারভিউ-এর কথা?'

'কাকে বলব? আমার খুব সংকোচ লাগে।'

'তোদের মতো মানুষের সংকোচের জন্যে অযোগ্যরা সুযোগ পেয়ে যায়।'

কিন্তু ইন্টারভিউ দিয়ে অবন্তী বুঝল কাজটা তার হলেও হতে পারে। এবং শেষপর্যন্ত হয়ে গেল। আকাশবাণীতে যোগ দিতে মাইনে বাড়ল। সেই সঙ্গে যোগাযোগ। নতুন নতুন উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠান নিয়ে আসতে লাগল। এখন আর কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই। কখনও ভোররাতে কখনও মাঝরাত পর্যন্ত। কিন্তু এই চাকরিতে আমেজ আছে, আছে গ্ল্যামার। যেটা বর্তমানেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

আকাশবাণীতে যখন ছয় মাস তখন আবার সমস্যা হল।

অবন্তী ডানাকাটা সুন্দরী নয়। কিন্তু ঈশ্বর মেয়েদের শরীর যেভাবে গড়লে পুরুষের চিত্ত নরম করে দেবে ঠিক সেইভাবে গড়েছেন। সে খুব ফর্সা নয় কিন্তু একটা চাপা আভা ছড়িয়ে থাকে তার মুখে। এইসব কারণে পথেঘাটে অফিসে অনুষ্ঠানে লোকের তাকে ফিরে ফিরে দেখে। ইদানীং কিছু বাড়তি পয়সা আসায় সে যেসব শাড়ি পরছে সেগুলোর দাম অল্প হলেও রুচির পরিচয় স্পষ্ট।

অশোকাদিকে অবন্তী বলেছিল, 'যাদের জীবনে প্রেম করার অবকাশ নেই তাদের ঈশ্বর কেন অবহেলায় তৈরি করেন না। কত সাধারণ মেয়েকে দেখি পথে যাওয়ার সময়, তাদের দিকে কেউ তাকায় না। আমারও চেহারাটা যদি সেরকম হত তা হলে বেঁচে যেতাম।'

অশোকাদি খাতা থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন, 'তোর জীবনে আর প্রেম করার অবকাশ নেই কেন?'

'তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে।'

'যখন তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখন সেটাই সত্যি ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা বদলেছে। বর্ধমানে ভাল টাকা দেওয়ার পরেও তোর কিছু জমছে। এখন যদি এমন কাউকে পাস যে তোকে সত্যিকারের ভালবাসবে তা হলে আপত্তির তো কোনও কারণ দেখছি না।'

আমি তো কাউকে ভালবাসতে পারব না।'

'কেন?'

'সবে না, ভেতর থেকেই আসবে না।'

'এটা তোর মনের ভুল।'

'না অশোকাদি। মাটি থেকে শেকড় উপড়ে যে গাছকে ফেলে দিয়েছি তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই।'

'সেই গাছের নেই, কিন্তু নতুন গাছ তো জন্মাতে পারে।'

'না। তা হলে ছোট হয়ে যাব। নিজের কাছে হেরে যাব।'

'স্বর্ণেন্দুর কোনও খবর পেয়েছিস, নাকি?'

'না। শেষপর্যন্ত মানুষটা আমার কথা শুনেছে বলে আমি কৃতজ্ঞ। অনেকগুলো বছর চলে গেল, নিশ্চয়ই এখন ঘোর সংসারী। আজ খামোখা খবর নিতে গিয়ে সেই সংসারে সমস্যা তৈরি করে কী লাভ। যে দিন গিয়েছে সেদিন সত্যি চলে গিয়েছে।'

বছর গিয়েছে কিন্তু শরীর ভরাট হয়েছে। এটাই এখন অবন্তীর কাছে প্রধান সমস্যা। দিল্লি থেকে একজন বঙ্গসন্তান কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন। আকাশবাণীতে তাঁর পদমর্যাদা প্রায় শীর্ষের কাছাকাছি। খুব গম্ভীর এবং সুদর্শন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। চল্লিশের ওপারেই বয়স, দেখলে অবশ্য বোঝা যায় না। ইনি প্রায়ই মিটিং করেন। প্রযোজকদের সঙ্গে, ঘোষকদের সঙ্গে। নতুন নতুন ভাবনা কার্যকর করতে চান।

একদিন অবন্তীকে ডেকে পাঠালেন, 'মিস চ্যাটার্জি। শব্দটার সঠিক উচ্চারণ কী? আত্মা না আত্‌মা?'

'আমার তো আত্মাই জানি।'

'কেউ কেউ আত্মার বদলে আত্‌মা বলছেন। আমি দিল্লিতে থাকতাম, আমার ভুল হতে পারে। শ্রোতারা কমপ্লেন করছে। গতকাল আপনি পড়েছেন, আপনাদের সাথে পরিচিত হলে শিল্পী উৎসাহিত হবেন। এই সাথে শব্দটি কি ঠিক?'

'আমাকে তাই লিখে দেওয়া হয়েছিল।'

'আপনি অন্ধের মতো যা লিখে দেওয়া হবে তা কেন পড়বেন? আপনাকে দেখে তো মনে হয় আপনি আলাদা ঘরানার মানুষ। অনেকেই সাথে বলেন। ওটা কবিতার বলে, গদ্যে সঙ্গে বলাই ভাল।'

সেই শুরু। ওটা যে নেহাতই বাহানা ছিল, পরিচয় করার একটা ছল মাত্র তা কয়েক দিনেই টের পেয়ে গেল সে।

রবীন্দ্রসদনে একটি অনুষ্ঠানের পর বেরিয়ে আসছে এমন সময় সেই ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আপনি যে এত ভাল কবিতা পড়েন তা তো কখনও বলেননি।'

'বলার মতো ব্যাপার নয়।'

'অসত্য কথা। আমি মুগ্ধ।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, এসবের জন্যে আপনি পারিশ্রমিক নেন?'

সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হল অবন্তী। ভদ্রলোক এই স্টেশনের একজন অন্যতম কর্তা। আর সে সরকারি চাকরি করে।

তবু অবন্তী জিজ্ঞাসা করল 'কেন?'

'তা হলে খাওয়াতে বলতাম।' হাসলেন ভদ্রলোক, 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। কোথায় থাকেন আপনি?'

'না না, আপনি কেন পৌঁছে দেবেন?'

'কেন? দিলে অন্যায় করা হবে কি?'

'তা নয়। আসলে আমি একা যাতায়াত করতেই অভ্যস্ত।'

ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হল। মাথা নেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেদিন।

কিন্তু কারণে অকারণে ঘরে ডেকে পাঠানো, কোনও অনুষ্ঠানে কবিতা বলার জন্য অনুরোধ জানানো, এসব লেগেই রইল।

একদিন বললেন, 'আপনি কি কাউকে বলেছেন আমি খুব বিরক্ত করছি?'

'না।'

'তা হলে বিরক্ত করছি না, কী বলেন?'

'সেটা আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন।'

'মিস চ্যাটার্জি, খোলাখুলি বলি, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।' কথাটা বলে ভদ্রলোক সরাসরি অবন্তীর মুখের দিকে তাকালেন।

'আর কিছু বলবেন?'

'আপনার প্রতিক্রিয়া জানাতে চাই। অবশ্য আপনি যদি কারও সঙ্গে ইতিমধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে থাকেন তা হলে—।'

'আমি কি এবার যেতে পারি?'

মাথা নেড়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপরই শোনা গেল অবন্তীকে শিলিগুড়ি বা কার্সিয়াং-এ বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের চাকরিতে বদলি অস্বাভাবিক ঘটনা নয় কিন্তু সাধারণত প্রমোশনের সময় বাইরে যেতে হয়।

কাটা হয়ে ছিল অবন্তী। বাইরে বদলি মানে জীবন একেবারে বদলে যাবে। হোস্টেলের জায়গা ছাড়তে হবে। পরে কলকাতায় যদি ফিরে আসে তা হলে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়বে। শেষপর্যন্ত আদেশটা এল না, কিন্তু ভদ্রলোক চলে গেলেন শিলচরে।

বর্তমানের বাড়িতে তখন সমস্যা প্রবল। হেমন্ত এবং বসন্ত বড় হয়ে গেছে। দুজনেরই পড়াশুনায় মন নেই। হেমন্ত কোনও মতে স্কুল পেরিয়েছে, বসন্ত তার অনেক আগেই স্কুল ছেড়েছে। প্রথম প্রথম মা এই নিয়ে হা-হুতাশ করত। তারপর বলতে আরম্ভ করল, কত এম-এ পাশ ছেলে ফেউ-এর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকরি জুটছে না। বেশি পড়াশুনা করে কী হবে, তা চেয়ে যদি ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে তা হলে আখেরে কাজ দেবে।

অবন্তী লক্ষ করেছে সে যখন যায় তখন দুই ভাই যতটা সম্ভব পারে তাকে এড়িয়ে চলে। হেমন্ত যে সিগারেট খাও তা গন্ধে বোঝা গেছে। মাকে বললে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়, 'আমি কি একটা দামড়ার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াব। একটা কাজ জুটিয়ে না দিলে তো আরও উচ্ছন্নে যাবে একথা বুঝতে পারিস না।'

হেমন্ত বাড়িতে ফিরলে অবন্তী সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'কী করতে চাস তুই?'

'ব্যবসা।'

'কীসের ব্যবসা?'

'রামানন্দদার স্টেশনারি দোকানটা বন্ধ আছে। ওর পক্ষাঘাত হয়েছে, ছেলে বা ভাই নেই। আমাকে বলেছে যদি দশ হাজার নগদ আর মাসে আড়াইশো টাকা দিলে আমাকে দোকানটা দিয়ে দেবে।'

'তুই চালাতে পারবি?'

'বাঃ, কেন পারব না। আমি তো সারাদিন দোকানে দোকানে ঘুরি।'

একটু চিন্তা করল অবন্তী, 'দশ হাজার দিলে দাঁড়াতে পারবি?'

'আরও লাগবে।'

'কেন?'

'দোকানে তো মাল নেই বললেই চলে। আমাকে তো এখনই কেউ ধারে মাল দেবে না। অর্ধেক টাকা দিলে অর্ধেক ধার দেবে। তার জন্যে কুড়ি হাজার লাগবে।'

'এত টাকা আমি কোথায় পাব?'

এই সময় মা ঘরে ঢুকল, 'কী এমন টাকা। তিরিশ হাজার। তুই তো ফাংশনে আবৃত্তি করে টাকা পাস বলে শুনেছি। নিশ্চয়ই সেগুলো জমিয়েছিস। তা থেকে কিছুটা দিয়ে দে।'

রাগ হয়ে অবন্তীর, 'আমার কাছে অত টাকা নেই। এত বছর ধরে যা পেয়েছি তার সবটাই তো তোমাকে দিয়ে গেছি। সব জেনেও যদি তুমি একথা বলো!'

'সব কোথায় জানি? তোর মাইনে বেড়েছে কত তা কি কখনও বলেছিস? সবাই বলে আপনার মেয়ের গলা শুনলাম রেডিয়াতে, বর্ধমানের গৌরব। আমার তাতে কী লাভ। ভাইরা বোজগার আরম্ভ করলে তোর ছুটি। সেটা যদি ভুলে যাস!' মা শেষ করল না কথা।

'ঠিক আছে। আমি দেখছি অফিস থেকে যদি লোন পাওয়া যায়। হেমন্ত, তুই কথা বল ওদের সঙ্গে।'

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করল, অবন্তী, জমা যা ছিল তা জড়ো করে পরের মাসে বর্তমানে মায়ের হাতে দিয়ে এল। দোকান খুলল হেমন্ত। প্রথম মাসে রোজগার হল পনেরোশো টাকা। অবন্তী ভেবেছিল মা বলবে এ বার পনেরোশো টাকা কম দিলেই হবে। কিন্তু মা কিছু বলল না। বরং সংসারে যে চাহিদাগুলো এতকাল ধামাচাপা দিয়ে রাখা ছিল সেগুলো লিস্ট নিয়ে বসল।

বছর খানেক বাদেও দেড় হাজারের বেশি হেমন্তর কাছ থেকে মা পেল না। অবন্তী জিজ্ঞাসা করলেই শুনতে পায়, 'ক্যাপিটাল না বাড়ালে ব্যবসা হয়? মাল স্টক করে যাচ্ছি।'

এইসময় একদিন বসন্ত এসে কলকাতায় অবন্তীর সঙ্গে দেখা করল। তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল অবন্তী। তখন বসন্ত সতেরো আঠারো বছরের তরুণ। মুখ ভর্তি দাড়ি। বলল, 'আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড এ্যাম্বাসাড়ার কিনব। প্রাইভেট ট্যাক্সি করে চালাব। হেভি প্রফিট।'

'আমি কি করতে পারি?'

'বাঃ তুই দাদাকে টাকা দিলি, আমি কী দোষ করলাম?'

'আমার টাকা কোথায়?'

'আশ্চর্য! তুই দাদাকে তিরিশ দিলি। স্টেশনারি দোকানের বিক্রি ফোঁটা ফোঁটা। জিন্দিগীতে দশ হাজার মাসে প্রফিট করতে পারবে না দাদা। আমি হেসে খেলে করব। আমি এতদিন গাড়ি চালানো শিখেছি, এবার লাইসেন্স বের করব।'

'আমি তো তোকে বললাম আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আমি যে প্রতিমাসে বছরের পর বছর—।' বলতে গিয়ে থেমে গেল অবন্তী ও এত ছোট যে ওকে বলে কোনও লাভ নেই।

'সেটা সবাই করে। আমার তিরিশ পেলেই চলে। গাড়িটা তেইশ-এ পেয়ে যাব। কিছু টুকটাক কাজ আছে।' বসন্ত ঘাড় শক্ত করল, 'বেশ, আমি তোকে মান্থলি এক হাজার দিয়ে যাব। তিরিশ মাসে শোধ।'

'আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না।'

'আশ্চর্য! গাড়িটা কি আমার জন্যে পড়ে থাকবে?'

'কবে বললে হবে?'

'আজই ওদের এ্যাডভ্যান্স করলে ভাল হয়।' বসন্ত বলল, 'বাবা নেই। কোনওরকমে এত বড় হয়েছি। তুই খুব কষ্ট করেছি আমাদের জন্যে তা আমি জানি। কিন্তু দিদি, তোকে ছাড়া আর কাকে বলব বল? তোর ছোটভাই পায়ের তলায় মাটি পাক এটা তুই চাস না?

আরও ধারের বোঝা বাড়ল। ব্যাঙ্কের খাতায় যেটুকু না রাখলে অ্যাকাউন্ট থাকে না ততটুকু রইল। যেদিন কলকাতায় চাকরি করতে এসেছিল সেদিনের সঙ্গে আজকের পার্থক্য ব্যাগে টাকা না থাকলেও মাথার ওপর ধারের বোঝা ছিল না। আজ শুধু বোঝা নয় পাহাড় জমে গেল।

অফিসের একটা সার্কুলার এল। যেহেতু এই চাকরি চব্বিশ ঘন্টার জন্যে তাই বিনা পারিশ্রমিকে হলেও অনুষ্ঠান করতে হলে কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিতে হবে। এই সার্কুলারের প্রতিক্রিয়া হল। বেশির বাগ কর্মী যাঁরা বাইরের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেন না তারা খুশি হলেন। কিন্তু তিন চারজন শিল্পী যারা শুধু আবৃত্তি করেই বাড়ি গাড়ির মালিক হয়েছেন তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেন। অবন্তী বুঝল তার পক্ষে চরম পেশাদার হওয়ার সম্ভব নয়। এই চাকরিটা তার জরুরি। ফলে বাইরের অনুষ্ঠান করা সে বন্ধ করে দিল।

এতে আর্থিক সমস্যা বাড়ল। ষাট হাজার টাকা ধারের কিস্তি শোধ করতে হচ্ছে সুদ সমেত। অথচ বর্তমানে আগের মতোই টাকা দিয়ে যেতে হচ্ছে। গতমাসে মাকে কথাটা বলেছিল, 'এখন তোমার দুই ছেলে রোজগার করছে। ধার শোধের টাকাটা যদি আমি কমিয়ে দিই তা হলে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধা হবে না?'

মা অবাক হয়ে বলেছিল, 'আমি তো তোকে আগে মতো নিজের জন্যে সামান্য রেখে পুরো টাকা দিতে বলছি না। হেমন্ত কোনওমতে সামলেছে। আর বসন্ত যা রোজগার করে তার অনেকটাই পুলিশ আর দালালরা নেয়। বাকিটা ও জমাচ্ছে আর একটা গাড়ি কেনার জন্যে। তোর ওপর আর কত চাপ দেবে। লজ্জাও তো লাগে।

'তা হলে ওদের রোজগারে তোমার কোনও লাভ হচ্ছে না?'

'এখনই হয়নি। একটা গাছ বড় হতে না হতেই ফল আশা করা বোকামি। তোর যদি অসুবিধা হয় না হলে বলে দে।'

বলতে পারেনি অবন্তী। পরে অনেক ভেবেছে সে। বলা উচিত ছিল। পনেরো বছর ধরে সে যা করেছে তারপর বলার অধিকার নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের রক্ত তাকে বাধা দিয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পরে মা বলেছিল, 'এর মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছে।'

'তোর বাবার এক বন্ধু খুব অসুস্থ। ওদের প্রচুর জমিজমা আছে। আমাদেরই স্বজাতি। অনেকদিন ধরে আমাকে বলছে ওঁর মেয়ের সঙ্গে হেমন্তর বিয়ে দিতে চায়। আমি বলেছি বেকার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন কি! তা এখন আবার খবর দিয়েছেন, চেলে তো রোজগার করছে, মারা যাওয়ার আগে আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করুন।' মা বলল।

'তুমি কী বললে?' অবন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল।

'আমি কী বলব ? আমার কি স্বাধীনতা আছে নিজে তেকে কিছু বলার! সেই যে বিয়ের পর এ বাড়িতে এসেছি, তখন থেকেই তো ঝিগিরি করে যাচ্ছি। কখনও জিজ্ঞাসা করেছিস, মা তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা? করিসনি। তুই তো আমার ছেলের বউ নস যে সংসারে থেকে আমাকে সাহায্য করবি। সেই ভোরবেলায় উঠে ঝাঁট দেওয়া কাপড় কাচা থেকে রান্না চাপানো শুরু করতে হয় রাতে সবাইকে গিলিয়ে বাসন মেজে তবে বিছানায় শরীর রাখতে পারি। দিনের পর দিন এই চলছে। আমার কী বলার আছে?'

'তুমি কি মনে করো ওই মেয়েটাকে ছেলের বউ করে আনলে তোমার সুবিধে হবে?'

'মফস্বলের মেয়ে, কলকাতার জল পেটে পড়েনি তো, অসুবিধে হবে কেন?'

'কিন্তু বিয়েতে যে খরচ হবে তা কে দেবে?'

'ওরা বউভাতের খরচ দেবে বলেছে।'

'দিন ঠিক করেছ নাকি?'

'সামনের মাসের বাইশ তারিখে ভাল দিন আছে, কে যেন বলছিল।'

মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অবন্তী। অনেক কষ্টে চোখের জল সামলেছিল সে।

হেমন্তর বিয়ে হয়ে গেল। বউ-এর নাম রত্না। বেশ মিষ্টি দেখতে। বিয়ের কিছুদিন বাদে বসন্ত কলকাতায়।

'কীরে, তুই?'

'মল্লিকবাজারে এসেছিলাম। দুনম্বর পার্টস কিনতে।'

'দুনম্বর কেন?'

'শস্তা হবে।' বসন্ত হেসেছিল, 'শুনেছিস দিদি ?'

'কী শুনব?'

'সব বানানো।'

'মানে?'

'বউদির বাপের মাত্র পাঁচ বিঘে জমি আছে সেটা ছেলে পাবে, বউদির কোনও চান্স নেই। অথচ মা বলত ওদের প্রচুর জমিজমা।'

'এসব খবরে আমার কী লাভ?'

'দূর! মা তো ওই ধান্ধায় রাজি হয়েছিল।'

'তোকে এসব কে বলল?'

'আরে আমি গাড়ি নিয়ে চারধারে ঘুরে বেড়াই। খবর আমার কানে আসবেই। আর একটা ব্যাপার ঘটেছে।'

অবন্তীর ভাল লাগছিল না। সে তাকাল।

'দাদার সঙ্গে বউদির অনেক আগে তেকে ইটুমিটু ছিল। পাবলিক বলছে বিয়ে না করে দাদার উপায় ছিল না। দাদাই ওই জমিজমার টোপ দিয়ে মাকে রাজি করিয়েছে।'

'তুই মাকে টাকা দিস?'

'বাঃ' দিই না? এই তো মা দাদার বিয়েতে, আমি স্ট্রেট আট হাজার দিলাম। তখন যদি

জানতাম এই কেস তা হলে দিতাম না।'

'প্রত্যেক মাসে দিস?'

'আমি তো রেগুলার খাই না। যে কদিন খাই হিসেব করে দিয়ে দিই।'

'কেন?'

'দ্যাখ দিদি, তুই আমাদের জন্য টাকা দিয়েছিস কারণ আমরা তোর নিজের ভাই। পরের বাড়ির মেয়ে ফুর্তি করে থাকবে বলে আমি টাকা দিতে পারব না। মাকে বলায় বলল, তাকে কী হয়েছে। স্বজাতি তো। অসবর্ণে বিয়ে করেনি। বোঝা!'

মাসে একরাতের জন্য বর্ধমানে যাওয়া অব্যাহত ছিল। হেমন্তর সঙ্গে দেখা হত, বসন্তর সঙ্গে কখনও সখনও। রত্না সামনা সামনি ভাল ব্যবহার করত। রবিবার সকালে হেমন্ত বাজারে যেত। সেদিন দুপুরে মাংস ভাত খেয়ে কলকাতায় ফিরে যেত অবন্তী। মাংসটা রাঁধত মা। গন্ধে গা গুলোলেও সেটা আর কাউকে রাঁধতে দিত না। মায়ের ঘরে শুত অবন্তী। তিন মাসের পর রাত্রে শুয়ে মা বলল, 'যা আছে সব ছেলেই পাবে, বুঝলি?'

'কী বলছ?'

'রত্নার ভাই বিষয় সম্পত্তি পাবে।'

'ও।'

'তুই তো থাকিস না, মেয়েটার জিভে দাঁত আছে।'

'জিভে দাঁত।'

'কথা বলে যখন মনে হয় কামড়ে দেবে।'

'ও।'

'মেয়েছেলের এমন হওয়া উচিত নয়।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'আমার কথা যেন শুনছে। প্রথম কাজকর্ম করত। মা, আমাকে দিন, আপনি কেন করছেন! এখন ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসার পর শুধু চিত হয়ে হাই তোলে।'

'ডাক্তার কেন? শরীর খারাপ?'

'হুঁ'। মা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আমি অবিশ্যি মুখে কিছু বলিনি। হাজার হোক এই বংশের ছেলে আসছে তো। তোর বাবার আত্মা শান্তি পাবে।' মা নিশ্বাস ফেলল।

অবন্তী অন্ধকারে মায়ের মুখ দেখতে পায়নি।

মা বলল, 'তুই নিশ্চই ভাবছিস এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা হচ্ছে কী করে? বিয়ে তো মাস তিনেক হয়ে গেল। সংযম না থাকলে তিন মাস তো অনেক সময়। তাই না? মুখ দেখে মনে হচ্ছে ছেলে হবে।'

'আমাকে এসব বলে লাভ কী?'

হঠাৎ মায়ের হাত শরীরে টের পেল অবন্তী মা বলল, 'তোর কষ্টের কথা আমি বুঝিরে। এখন আমি অনেককেই বলছি। তোর বয়সের সঙ্গে মানায় যারা তাদের বেশিরভাগই দোজবরে। বউ মরেছে, বাচ্চা আছে। প্রায় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তেমন ভাল ছেলে পেলে আমি আর দেরি করব না।'

'কে বিয়ে করবে?'

'মেয়েছেলে যদি সংসারের স্বাদ না পায় তো জীবন মরুভূমি হয়ে যায়। তোর বয়সে কত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, বাচ্চা হচ্ছে।'

'আমার জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।'

'কেন? আমি তোর মা নই?'

'মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়।'

হঠাৎ মা ডুকরে কেঁদে উঠল। অত রাত্রে ওই চাপ কান্নাও বেশ স্পষ্ট। নিশ্চয়ই এ বাড়ির বাসিন্দারা তা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কেউ কোনও শব্দ করছে না। অবন্তী বাধা দিল না। অনেকদিন ধরে যে কথা মনে ছোবল মারত বের করে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

পরদিন সকালে মা আবার স্বাভাবিক। হেমন্তকে বাজারে পাঠিয়ে মাংস আনিয়ে চমৎকার

রাঁধল। সে সময় কী একটা কাজে অবন্তী রান্না ঘরের সামনে গিয়েছিল। সে দেখতে পেল দরজার বাইরে থেকে রত্না উঁকি মেরে ভেতরে কিছু দেখছে। তার উপস্থিতি টের পেয়ে সরে এল রত্না। তারপর নিচু গলায় বলল, 'গন্ধ শুকলেও তো অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায় না?'

'তাই তো শুনছি ওটা কথার কথা।

'মা ঢাকনা সরিয়ে মাংসের গন্ধ শুকছেন। কথার কথা হলে অর্ধেক খাওয়া হয়নি।'

তিন মাসের জন্যে আগরতলায় যেতে হবে। অফিসের অর্ডার। বর্তমানে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে অবন্তী এক শনিবার রাত্রে পৌঁছাল। মা আশা করেনি তাকে। খবরটা শুনে মুখ ভার হল। অবন্তী বলল, 'তোমার চিন্তা নেই। আমার টাকা ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে।'

'আমি যে সামনের মাসের প্রথম রবিবার সকালে ওদের আসতে বললাম।'

'কাদের?' অবাক হল অবন্তী।

'তিন তিনটে মিনিবাস, দুটো রুটের বাস, পাঁচটা ট্যাক্সির মালিক। বয়স বলছে আটচল্লিশ। তোর থেকে কত আর বড়। বউটা বাঁজা ছিল। মাস ছয়েক হল অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে। তোকে বিয়ে করতে চায়।'

'আমাকে।'

'হ্যাঁ, বর্ধমানেরই তো ছেলে। অনেকদিন তেকে নাকি তোকে দেখছে। একটাই দাবি, চাকরি করা চলবে না। আমি বললাম, অত সম্পত্তির যে মালিক তার বউ-এর চাকরি করার কী দরকার। ছেলের মাসি এসেছিল। বলল, আপনার মেয়ে আপনাকে যে টাকা দেয় তার অনেক বেশি বিয়ের পরও আপনাকে দেবে। সব শুনে ভালই লাগ। ওরা ব্যানার্জি। আসতে বলেছিলাম।'

'তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ মা।'

'কেন?'

'আমাকে আগরতলায় যেতেই হবে। তা ছাড়া আমার বিয়ে করার কোনও বাসনা নেই। ইচ্ছেগুলো মরে গিয়েছে।'

'তুই এখনও স্বর্ণেন্দুর কথা মনে রেখেছিস?'

'দূর। সেসব তো কবেই তুমি শেষ করে দিয়েছ।'

'তোর ভালর জন্যেই করেছি। নইলে এতদিন হাড়ে দুর্বে গজিয়ে যেত। স্কুল মাস্টারের বউ হওয়ার চেয়ে—।'

'ঠিক আছে, চুপ করো। এই পাঁচালি আয় ভাল লাগছে না।'

রাত্রে ঘুম এল অনেক দেরিতে। অনেকদিন পরে স্বর্ণেন্দুর কথা মনে করিয়ে দিল মা। স্বর্ণেন্দু নিশ্চয়ই এখন ছেলেমেয়ের বাবা। সেটাই স্বাভাবিক।

সকালে বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়েই শুনল পাশের ঘরে হেমন্ত বলছে, 'বাজারের ব্যাগ দাও।'

'কেন? সব তো আছে।'

'সব মানে?'

'আলু পেঁয়াজ তরকারি। মাছও আছে কয়েকটি।'

'ওঃ, দিদি এলে মাংস হয়। দিদি মাংস খেতে ভালবাসে। দেখনি দিদি এলে আমি মাংস নিয়ে আসি। দাও।'

'আজ মাংস আনতে হবে না।'

'কেন?'

'অত আদিখ্যেতা কীসের। যা টাকা দেয় তাতে অত মাংস হয় না। পেটে যে এসেছে তার জন্যে টাকাটা জমাও এরকম কাঁচা খোলা পুরুষ আমি জন্মেও দেখিনি।' রত্না বলল।

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমার ব্যবসায় টাকা দিদিই দিয়েছে।'

'তাতে কী হয়েছে? বাপ নেই তাই রোজগেরে দিদি দিয়েছে। তাই বলে যদি পাই পয়সা মিটিয়ে দিতে হয় তার চেয়ে লজ্জার কী আছে।'

অবন্তী আর দাঁড়াল না। কিন্তু সে তো ইচ্ছে করে শুনতে চায়নি। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল হেমন্ত গম্ভীর মুখে বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে ডাকল, 'হেমন্ত।' হেমন্ত তাকাল।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাজারে'।

'আমার জন্যে মাছ মাংস আনিস না। তোরা খেলে নিয়ে আয়।'

'কেন?' হেমন্তর মুখ শুকিয়ে গেল।

'আর-বলিস না। ডাক্তার খেতে নিষেধ করেছে।'

'কেন?'

'কী জানি। কোনওরকম অ্যানিমাল প্রোটিন খাওয়া চলবে না। তাই আমি এখন নিরামিষ খাচ্ছি।'

'না, না, মাছও চলবে না।'

'এসব তো শুনেছি যারা ঠাকুরের ভক্ত হয় তারা করে।'

'আমি সব ঠাকুরেরই ভক্ত।' হাসার চেষ্টা করে নিজের ঘরে ঢুকে গেল অবন্তী। মা বলল, 'নিরামিষ খাওয়া ভাল। এই তো আমি তোর বাবার চলে যাওয়ার পর নিরামিষ খেয়ে আছি, আমার তো কোনও অসুবিধে হয়নি। একটু রোগা হয়েছি মাত্র, তা রোগা হওয়া ভাল।'

অবন্তী বলল, 'ঠিক বলেছ।'

সেদিন আর একটি সিদ্ধান্ত নিল অবন্তী। এখন থেকে আর প্রতি মাসে বর্ধমানে আসা বন্ধ করতে হবে। নেহাত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আসবে না।

সকালে অবন্তী বাড়িটাকে ঘুরে দেখল, অনেক স্মৃতি এর প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে। বাড়িটার অনেক জায়গায় প্লাস্টার খসে পড়েছে। কোথাও কোথাও চিড় ধরেছে। স্মৃতি বোধহয় এই ভাবেই ভেঙে চুরে যায়।

হেমন্ত বলল, 'দিদি, তুই কি আজই টাকাটা পেয়ে যাবি?'

'চেষ্টা করব।'

'কালকেই কিছু কিছু পেমেন্ট করতে হবে।'

'তুই এক কাজ কর। কাল দুপুর বারোটার আমার অফিসে আয়।'

'আমি যাব? কেন তুই টাকাটা নিয়ে আসতে পারবি না?'

'একবার অফিসে ঢুকলে কখন ছাড়া পাব বলতে পারছি না। তোকে যখন কালই পেমেন্ট করতে হবে। তখন তুই গিয়ে টাকাটা নিয়ে আয়।'

'ঠিকই আছে।'

বেরুবার সময় সে কাবেরীকে ডাকল, 'রত্না তোমার দিদি। ওর কথা শুনে চলবে। আসি রত্না। ভাল থেকো তোমরা।'

'দিদি, মায়ের নিয়মভঙ্গে মাংস করতে বলে যাও।'

'কেন?'

'আমার মনে হয় মায়ের খুব কষ্ট হত মাংস খেতে পারেন না বলে। ওই জন্যেই মাংস করা উচিত। আপনার ভাই আপত্তি করছে।'

অবন্তী হেমন্তের দিকে তাকাল, 'তোর হাতে যেমন টাকা থাকবে তেমন করবি। যদি পারিস মাংস করিস।'

সেই চলে আসা।

পরদিন ভাই-এর হাতে টাকা তুলে দিয়েছিল অবন্তী। বলেছিল, 'এটা মায়ের জন্যে আমার শেষ দেওয়া।'

হেমন্ত বলেছিল, 'আমরা তো সাধ্য নেই বলে করতে পারি না।'

'এবার থেকে যেটুকু সাধ্য সেটুকু করিস।'

'তুই কবে আসছিস।'

'কেন?'

'মায়ের শ্রদ্ধা নেই সেখানে গিয়ে কী লাভ।'

'তুই মাকে শ্রদ্ধা করিস না?'

'না করলে তোকে সহজেই বলতে পারতাম।'

হেমন্ত করা বাড়ায়নি। তারপরে কয়েকবার টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছে। জবাব দেয়নি অবন্তী। তার ধার শোধ হয়েছে। সামান্য হলেও জমতে শুরু করেছে। আটান্ন হতে আর বেশি দেরি নেই, তারপর?

ইতিমধ্যে জীবনের দ্বিতীয় আঘাত সহ্য করতে হল অবন্তীকে। প্রথম আঘাত যদি বাবা কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের হঠাৎ চলে যাওয়া, তো দ্বিতীয় আঘাত অশোকাদির প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করে মারা যাওয়া। গলায় ক্যানসার হয়েছিল অশোকাদির। এক ঘরে থাকলেও ব্যাপারটাকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন মহিলা। স্কুলের চাকরি শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু এটা ওয়ার্কিং উইমেন'স হোস্টেল তাই নোটিস এসেছিল ছেড়ে দেওয়ার। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে কর্তৃপক্ষ চাপ দিচ্ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত ঠাকুরপুকুরে নিয়ে যাওয়া হল অশোকাদিকে। ডিউটির ফাঁকে প্রতিটি দিন সেখানে ছুটত অবন্তী। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অশোকাদির। কাগজে লিখে বলতেন তাঁর কথা। শেষবার লিখেছিলেন, 'একা থাকিস না। কাউকে তো জীবনে নিবি না, কোনও আশ্রম বা হোমে গিয়ে থাক, রাতগুলো বড় নির্জন হয়ে যাবে রে!'

অশোকাদির কথাগুলো ভীষণভাবে নাড়া দিতে লাগল অবন্তীকে। ওঁর জিনিসপত্র প্যাক করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত দুর সম্পর্কের এক বোনপো এসে নিয়ে গেল সেগুলো।

এইসময় বিজ্ঞাপনটা নজরে এল। একজন রিটায়ার্ড মিলিটারি ডাক্তার ঝাড়গ্রামে একটি বৃদ্ধাবাস করেছেন। এতদিন তিনি নিজেই দেখাশোনা করতেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তাঁর একজন সাহায্যকারী দরকার।

টেলিফোন নাম্বার দেখে ফোন করল অবন্তী। কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামে ফোনের লাইন পেলেও কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। ভদ্রলোক তাকে ঝাড়গ্রাম গিয়ে দেখা করতে বললেন।

পরের রবিবার সকালে ঝাড়গ্রামে পৌঁছে রিকশা ধরল অবন্তী। শহর থেকে বেরিয়ে দুপাশে শালগাছের সারি রেখে সে যখন বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছল তখন বেলা দশটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে গাছগাছালির মধ্যে আশ্রম তৈরি হয়েছে। তারের বেড়া দিয়ে জায়গাটা আলাদা করা হয়েছে। অফিসে ঢুকে ডাক্তার সাহেবের দেখা পেল অবন্তী।

'আপনি অবন্তী চ্যাটার্জি? বসুন। জল খাবেন?'

ভাল লাগল অবন্তীর। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই একজন কাজের লোক জল নিয়ে এল। সেটা খাওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধ অপেক্ষা করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার বায়োডাটা নিয়ে এসেছেন?'

'না। আমি কথা বলতে এসেছি।'

'বলুন কী কথা বলতে চান?'

'আপনি কী ধরনের সাহায্য চাইছেন?'

'বছর দশেক আগে আমি এখানে বৃদ্ধাশ্রম খুলি। যেসব মানুষ একটা এবং কিছুটা সঞ্চয় আছে তাদের বাকি জীবনটা আনন্দে রাখার চেষ্টায় এই আশ্রম। এখানে প্রতিটি মানুষকে মাসে আটশো টাকা দিতে হয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওই টাকায় সারা মাসের খরচ চলে না। খরচ বলতে খাওয়াদাওয়াই নয়, ওষুধপত্র, রিক্রিয়েশন, লাইব্রেরি সবই রয়েছে। এ জন্যে বাড়তি যে খরচ তা আমার একটা ট্রাস্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই কারণে কাউকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় না যে তাঁরা অন্যের দয়ায় আছেন। এখন পর্যন্ত আমরা চল্লিশ জনের ব্যবস্থা রেখেছি যদিও এই মুহূর্তে বত্রিশজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা রয়েছেন। আর হ্যাঁ, যে কেউ ওই টাকা দিয়ে এখানেথাকতে পারেন না। আমি ইন্টারভিউ নিই। যদি মনে করি উনি সত্যি একলা এবং আটশো টাকা দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর আছে তা হলেই তাঁকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। আর কিছু?'

'এখানে যারা আছেন তাঁরা কি সবাই বাঙালি?'

'হ্যাঁ। কারণ অবাঙালি কেউ আবেদন করেননি।'

'ইন্টারভিউতে আপনি কী জানতে চান?'

'অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ঘাড় থেকে বাবা মাকে নামিয়ে দিতে এখানে নিয়ে আসে। কিন্তু বাবা মায়ের টান থাকে তাঁদের সঙ্গে থেকে যেতে। ফলে এঁরা এখানে এলেও সংসারের প্রতি সবসময় টান অনুভব করেন। যার জন্য তাঁদের মন বিচলিত হয়, মানিয়ে নিতে পারেন না। এঁদের

আমরা এখানে নিতে চাই না। যিনি বয়সের কারণে অক্ষর হয়ে যাচ্ছেন, কোনও পিছুটান নেই তাঁকেই আমরা পছন্দ করি।'

'এতদিন আপনি সাহায্যকারী চাননি কেন?'

'প্রয়োজন হয়নি। এখন আমার শরীর ভেঙেছে। কলকাতায় গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। আমি চাই না আমার জীবদ্দশায় এই আশ্রয় বন্ধ হয়ে যাক। বন্ধ হলে এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আপনি কী করেন?'

'আমি আকাশবাণীতে চাকরি করি।'

'কত বছর চাকরি আছে?'

'এখনও বছর আটেক।'

'সংসারে আর কে কে আছেন?'

'আমার কোনও সংসার নেই। আমি ওয়ার্কিং ওম্যা হোস্টেলে থাকি।'

'বাড়ি কোথায় ছিল?'

'বর্ধমানে। বাবা শিক্ষক ছিলেন। মা এখন নেই।'

'বিয়ে করেননি?'

'না।'

'কেন?'

'সুযোগ হয়নি।'

'ভাই বোন?'

'বোন নেই। ভাইরা সাবালক, সম্পর্ক নেই।'

'ভাল চাকরি করেন, সেটা ছেড়ে এখানে আসার ইচ্ছে কেন?'

'একা থাকতে আর ভাল লাগছে না।'

'আমার কাছে যতগুলো আবেদনপত্র এসেছে তাতে সবাই জানতে চেয়েছে কত পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে। আপনি কী আশা করেন?'

'বললাম তো, একা থাকতে পারছি না।'

'আপনার নাম ঠিকানা, অফিসের ঠিকানা এখানে লিখে দিন।'

অবন্তী লিখন।

ভদ্রলোক বললেন, 'এখন এগারোটা বাজে। ফেরার ট্রেন বেলা দুটোয়। তা হলে দুপুরের খাবার এখানেই খেয়ে যান।'

অবন্তী আপত্তি করল। 'না না। কোনও দরকার নেই।'

'আপনি দুপুরে খান না?'

হেসে ফেলল অবন্তী, 'খাই। কিন্তু কাউকে বিব্রত করতে চাই না।'

'বিব্রত হবে বুঝলে আপনাকে বলব কেন? চলুন, আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।' বৃদ্ধ উঠলেন।

সুন্দর সবজির বাগান করা হয়েছে। ছোট ছোট কটেজ চারপাশে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। লাইব্রেরিটা মাঝখানে। খাওয়ার ঘর এবং রান্নার ঘর একপাশে।

'ও ডাক্তারবাবু, ইনি কে? এত অল্প বয়সে এখানে থাকতে এলেন নাকি?' একজন বৃদ্ধা তাঁর কটেজ থেকে বেরিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক বললেন, ইনি বাসন্তীদেবী। খুব সুন্দর ছবি আঁকেন। মা, এঁর নাম অবন্তী চট্টোপাধ্যায়। আপনাদের দেখতে এসেছেন কলকাতা থেকে।'

'কেন? কলকাতায় দেখার জিনিস আর কিছু নেই নাকি?' বৃদ্ধা রেগে গেলেন।

অবন্তী এগিয়ে গেল তাঁর কাছে 'মাসিমা, আমি আপনাদের দেখতে আসিনি। আমি এখানে থাকতে চাই তাই জায়গাটাকে দেখতে এসেছি।'

'ও, তাই বলো। তা মা, তোমার তো এমন কিছু বয়স নয়, আমার মেয়ে থাকলে তোমার বয়সী হত, এত তাড়াতাড়ি আশ্রমে থাকতে চাও কেন?'

'বয়সের সঙ্গে কি সমস্যার সম্পর্ক আছে মাসিমা। আপনি তো আমার চেয়ে অনেক বেশি

জানেন।' অবন্তী হাসল।

'ছাই জানি। এখনও একে যাচ্ছি কিন্তু ঈশ্বরের মুখটা ঠিক কী রকম হবে বুঝে পাচ্ছি না।' বৃদ্ধা ফিরে গেলেন।

আশ্রমে ডিপ টিউবয়েল রয়েছে। সেখান থেকে পাম্প করে জল ওপরের ট্যাঙ্কে তোলা হয়। ডাক্তার সাহেব যতটা পারেন আধুনিক ব্যবস্থা করেছেন। এমন কী বড় জেনারেটারেরও ব্যবস্থা আছে। কর্মী আছেন আটজন।

ডাইনিং রুমে খাওয়া হল। একসঙ্গে পঞ্চাশজন বসতে পারেন। দশটি অদ্ভুত। যে যাঁর কটেজ থেকে বেরিয়ে এলেন। কারও হাতে লাঠি, কেউ কুঁড়িয়ে হাঁটছেন, কেউ হনহনিয়ে। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'দুজন আজ লাঞ্চে আসতে পারবে না। একজনের জ্বর আর একজনের বাতের ব্যথা বেড়েছে। একেবারে শয্যাশায়ী। ওঁদের পথ্য পৌঁছে দেওয়া হবে।'

'এদের চিকিৎসা আপনি করেন?'

'না। ঝাড়গ্রামের একজন ডাক্তার দুবেলা এসে দেখে যান। ইর্মাজেন্সি হলে আমি যাই।' খাওয়ার টেবিলে অবন্তীর পাশে এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ বসেছিলেন। ডাক্তার সাহেব অবন্তীর পরিচয় দিয়ে বললেন, 'উনি ধ্রুবজ্যোতি বসু। গান করেন। একসময় এইচ এম ভি থেকে রেকর্ড বেরিয়েছিল।'

'অতীতের কথা কেন টেনে আনছেন ডাক্তার। তুমি কী করো মা?'

'আকাশবাণীতে চাকরি করি।'

'বাঃ। যখন বীরেন ভদ্র ছিলেন তখন যেতাম। পঙ্কজবাবুর সঙ্গেও গিয়েছি। তা এখানে কেন?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি সাহায্যকারী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, ইনি আবেদন করতে এসেছেন।'

'হুম। তোমার মধ্যে যোগিনীভাব স্পষ্ট। কিন্তু মা আমরা সংসারে ছিলাম, সব ছিল, কিন্তু মায়া ছিল না। এখানে এসেছি তার সন্ধানে। তুমি সেটা দিতে পারবে তো?' ধ্রুবজ্যোতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওখানে আমিও মায়া থেকে বঞ্চিত। জানি না পারব কি না!'

'নদীর দারের মানুষ জলের মূল্য বোঝে না মা, বোঝে মরুভূমির মানুষ।'

চলে আসার সময় ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি সামনের মাসের এক তারিখে কলকাতায় যাব। সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসব। তুমি এই ফোন নাম্বারে দুপুরে ফোন কোরো।'

রিকশায় বসে জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলল অবন্তী। ধুধু করছে চারধারে। যেমন হাওয়া তেমন রোদ। শীতকালে যদি প্রবল শীত, গ্রীষ্মে তেমনি কড়া গরম। আশেপাশেও কোনও মানুষজন নেই। একেবারে নিজেদের মতো থাকা। ডাক্তার সাহেবের কোনও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল না। সে যদি পয়সা কখচ করে তাকতে চায় তা হলে কি থাকতে দেবেন? প্রশ্নটা করা হয়নি। এখন অবসর নিলে সে আটশো টাকার অনেক বেশি পাবে। সামনের মাসের এক তারিখে প্রশ্ন করতে হবে।

বিকেলে হোস্টেলে এসে অবন্তী দেখল ভিজিটার্স রুমে বসন্ত বসে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'তুই?'

'হ্যাঁ। দুপুরে এসেছিল। বর্ধমানে গিয়েছিল?'

'না তো।'

'এরা বলল তুই কলকাতার বাইরে গিয়েছিস।'

'কী দরকার?'

'বউদি ঝামেলা করছে খুব। দাদার তো কোনও ভয়েস নেই।'

'কী হয়েছে?'

'কাবেরীকে বলেছে মাঝেমাঝে এসে থাকতে পারো, নিজের খরচে খাবে কিন্তু তোমার স্বামীর থাকা চলবে না। আরে আমরা কি ওর পয়সায় খেতে যাচ্ছি? তুই একটা ব্যবস্থা কর।'

'আমি এ সবের মধ্যে নেই। তোর গাড়ির ব্যবসা তো লাটে উঠে গেছে। বিয়ে করেছিস, মেয়ে হয়েছে, কোনও দায়িত্ব নেই তোর?'

'সেই জন্যেই তো বাড়িতে স্থিতু হয়ে বসতে চাইছি। কিন্তু ওরা সেটা দেবে না। কেন? ওটা

কি আমার বাপের বাড়ি নয়? আমার কোনও রাইট নেই, বল দিদি? বলে, মামলা করো। আমিও বলেছি, তোমাদের চরিত্র সবাই জেনে গেছে। দিদির পয়সায় খেয়ে বড় হলে আবার এমন ব্যবহার করলে যে মায়ের কাজ শেষ হওয়ার আগেই দিদি চলে যেতে বাধ্য হল।' বসন্ত বলে যেতে লাগল, 'বউদি কী বলল জানিস? তোমার দিদি তার মাকে টাকা পাঠাত। চোখ বোজার পরেই তিনি হাত মুঠো করেছেন। আমরা এখন তার খাই না পারি।'

'এসব কথা আমার ভাল লাগছে না বসন্ত।'

'ভাল তো লাগবেই না। এত স্যাক্রিফাইস করার পর এসব শুনতে কারও ভাল লাগে! কিন্তু ওই বাড়িতে তোরও রাইট আছে দিদি।'

'আমার কিছু চাই না।'

'ও। তা হলে তুই তার অংশটা কাবেরীর নামে লিখে দে।'

'তোকে তো মামলা করতে বলেছে।'

'দূর! নাগরিক কমিটির সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা বলেছে দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ করে দেবে। বর্ধমানে থেকে নাগরিক কমিটিকে অস্বীকার করার হিম্মত হেমন্ত চ্যাটার্জির হবে না। তুই একটা স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিবি?'

'না। তোরা যখন ভাগাভাগি করছিস দুভাগ করে নে।'

'ঠিক আছে দিদি, শ'দুয়েক টাকা দিবি? কাবেরীকে ডাক্তার দেখাতে হবে।' বসন্ত হাত পাতাল।

'কী হয়েছে কাবেরীর?'

'মেয়েটার ভাই বোন হবে বোধহয়।' উদাস গলায় বলল বসন্ত। ঠাস করে একটা চড় মারল অবন্তী। তারপর ব্যাগ খুলে দুটো একশো টাকার নোট ছুড়ে দিল, 'আর কক্ষনও আমার কাছে আসবি না। তোরা আমার কাছে মৃত বেরিয়ে যা এখান থেকে।'

টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে গালে হাত বোলাতে বোলাতে চলে গেল বসন্ত। ঘরে ঢুকে বিছানায় পাথরের মতো বসেছিল অবন্তী। কাবেরীর মুখটা মনে পড়ছিল। এই মেয়েগুলো এত বোকা হয় কেন।

ঠিক দুপুরবেলায় ফোন করল অবন্তী। আজ এক তারিখ। ডাক্তার সাহেব নিজেই ফোন ধরলেন, 'কেমন আছ তুমি?'

'ভাল।'

'মতের পরিবর্তন হয়েছে?'

'না। তবে আপনি যদি আমাকে কাজটা না দেন তা হলে আশ্রমের আবাসিক হয়ে থাকতে দেবেন কি?'

'ওখানে একটা এজ বার আছে। অন্তত আটান্ন হতে হবে। তোমার সম্পর্কে সব খবর পেয়েছি। কত টাকা চাও?'

'একটা পয়সাও চাই না।'

'অনেক ধন্যবাদ। তুমি রেজিগনেশন লেটার দাও। ওসব করতে সময় লাগবে কতদিন?'

'মাসখানেক।'

'বেশ। সব শেষ করে চলে এসো।'

'আপনি আমাকে আপনার সাহায্যকারীর কাজটা দিচ্ছেন?' চিৎকার করে উঠল অবন্তী। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'সরি। অত ভাল আবৃত্তি যে করে তাকে সহকারীর পদ দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সহকারী মানে মাথার ওপর সবসময় একজন থাকবে যাকে সাহায্য করতে হবে। তোমাকে দিন পনেরো দেখিয়ে দেওয়ার পর আমি কলকাতায় চলে আসব। মাঝে মাঝে যাব। অতএব তোমাকে একাই সব সামলাতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমার পদের একটা নতুন নামকরণ করা দরকার। ভেবে দেখি।' ডাক্তার সাহেব বললেন।

অফিসের সবাই অবাক। এত তাড়াতাড়ি ভি আর নেওয়ার কোনও মানে নেই। আশ্রমে যাচ্ছেন? সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবেন নাকি? এই সব কোলাহলের মধ্যে একা হোস্টেলে এল অবন্তী। যা

কিছু টাকা কড়ি পাওয়া গেল তা আপাতত নিজের ব্যাঙ্ক, পরে জাড়গ্রামের স্টেটব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করাতে হবে। পেনসন নেবে ওখেকেই। পে কমিশনের কল্যাণে সেটা যথেষ্ট ভাল হয়েছে। হোস্টেলে নোটিশ দিয়েছিল সে। সেখানেও একই প্রশ্ন। মানুষ যখন মারা যায় তখন কেউ প্রশ্ন করে না, যখন কেউ নিজের মতো একা থাকতে চায় তখন এত কৌতূহল কেন?

পনেরো দিন হাতে কলমে শিখিয়ে গেলেন ডাক্তার সাহেব। এই আশ্রমের বাসিন্দাদের নামে আলাদা আলাদা খাতা আছে। কার কী অসুখ, কে কী খেতে ভালবাসেন থেকে আরও অনেক তথ্য সেখানে দেওয়া আছে। এঁরা সবাই টাকা দেন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। এটা ডাক্তার সাহেবই ব্যবস্থা করেছেন। সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে যাতে অবন্তী টাকা তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করে গেলেন। এখন থেকে প্রতি মাসে একবার করে এখানে আসবেন।

যাওয়ার আগে ডাক্তার সাহেব বলেছেন, 'তোমার একটা নতুন নামকরণ করেছি।

নিশ্চয়ই জেনে গেছ।'

'না তো!'

'এখানকার সবাই তোমাকে কী বলে ডাকছে?'

'দিদিভাই।'

'ওটা আমার দেওয়া।' ডাক্তার সাহেব হাসলেন, 'তোমাকে এখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়েছি। আর সবাই দেখতে দেখতে পরিচিত হয়ে যাবে। তবে যদি কোনও সমস্যায় পড় যা নিজে সমাধান করতে পারছ না তা হলে আমাকে জানিও।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলো।'

'শুনলাম আপনি বিপত্নীক, ছেলেমেয়ে নেই। তা হলে এখানে থাকছেন না কেন? এখানে থাকলেই তো ভাল হত।'

'এই আশ্রমের জন্যে যে ফান্ড রয়েছে তার একটা পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া কলকাতায় অনেক কাজ রয়েছে।'

'আপনি বলছিলেন, চিকিৎসা করাবেন। কী হয়েছে আপনার?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ঘাবড়ে যেয়ো না। এখনও বছর দশেক লড়ে যাব। আমার ক্যানসার হয়েছে। সরোজবাবুর কাছাকাছি থাকতে চাই। একেবারে প্রাথমিক স্টেজ, ভয়ের কিছু নেই।'

যেন অবন্তীর কোনও ঘনিষ্ঠ ওই রোগে আক্রান্ত এবং ডাক্তারসাহেব তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেলেন। ওঁর গাড়ি চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। এই মানুষটিকে খুব অল্পসময় দেখতে পেল সে। কিন্তু বড় অড়াতাড়ি মানুষটা তার আপন হয়ে গিয়েছেন। যে আপন হয় ঈশ্বর তাকে সরিয়ে নিতে এত তৎপর হন কেন?

ভোরে ঘুম থেকে ওটে অবন্তী। তার কোয়ার্টারস অফিসের লাগোয়া। ঘুম ভাঙতেই মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ে সে আশ্রমটাকে পাক দিতে। তখনও ঘাসে ঘাসে শিশির মাখামাখি।

'ঘুম হয়েছে মেসোমশাই?'

এক বৃদ্ধ খালি গায়ে পাজামা গেঞ্জি গায়ে সূর্য দেখছিলেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ঠিক তিনটে। তিনটে থেকে জেগে আছি মা। ঘড়ি দেখছি কখন ভোর হয়! ভোর হতেই বেরিয়ে এলাম।'

'এটা তো ঠিক কথা নয়। আপনার আরও ঘন্টা দুয়েক ঘুমোনো উচিত।'

'উচিত কাজগুলো এ জীবনে করা হল না। গত কুড়ি বছর ধরে নির্ঘুম রাত চলছে। বিচ্ছিরি অসুখ।' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

'না। আপনার এই অসুখটাকে সারাতেই হবে।' অবন্তী বলল।

'ভাল লাগল মা। আমি চেষ্টা করেও তো পারিনি, দ্যাখো, পারো কিনা।'

এই ভদ্রলোকের নাম যতীন সাহা। খুব কম কথা বলেন। কারও সঙ্গে তেমন মেশেন না। কিন্তু অবন্তী কথা বলে দেখেছে উনি মোটেই গম্ভীর নন।

আর একটু এগোতেই এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। থুরথুরিয়ে হাঁটছেন। অবন্তী ডাকল, 'কোথায় যাচ্ছেন মাসিমা?'

বৃদ্ধা দাঁড়ালেন। এঁর কণ্ঠস্বর খুব সরু, বাচ্চা মেয়ের মতো, 'মনিং ওয়াক করছি।' 'উঁহু! আমি জানি কোথায় যাচ্ছে আপনি?'

হেসে ফেললেন বৃদ্ধা, 'না গেলে মনটা ভাল লাগে না। সকাল বিকেল এই সময়টায় যা কিছু গপ্পো হয়। তারপর ফিরে এসে স্নান করে পূজোয় বসতে হবে।' একটু থেমে বললেন, 'তুমি মা খুব ভাল।'

'চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।'

'আমার হাতটা ধরো।'

ওরা এগিয়ে গেল। একটা গাছের নীচে বাঁধানো বেদির ওপর আরও চারজন বৃদ্ধা বসে আছেন। একজন চেঁচিয়ে বললেন, 'ও নলিনীদি, তুমি দেখছি পথ চেনো না, তোমায় হাত ধরে নিয়ে আসতে হচ্ছে।'

নলিনীদি তাঁর সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না।'

দুলাইন গেয়ে বললেন, 'আমার সখাকে নিয়ে এলাম।'

একজন বললেন, 'ওমা! একী কথা। সখা কেন, সখী বলো!'

সবাই হেসে উঠল। প্রথমজন বললেন, 'যাই বলো নলিনীদি, তোমার সাহস খুব বেড়ে গেছে। ভুল সুরে গেয়েছ বলে গত সপ্তাহে ধমক খেয়েছ, মনে নেই? মাস্টারমশাই কাছে থাকলে হয়ে যেত।'

অবন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'মাস্টারমশাই কে মাসিমা?'

নলিনী বললেন, 'ওই যে ধ্রুবজ্যোতিবাবু। নিজে ভাল গান তো তাই কেউ ভুল গাইলে উনি রেগে যান। আমার বাবা সব সুর এখন মনে আছে? সারাজীবন গলা খুলে গাইবার সুযোগ হয়নি।'

প্রথমজন বললেন, 'এই মেয়েটা, তোর মতলব কী বলত?'

'কেন মাসিমা?' অবন্তী তাকাল।

'তুই সবাইকে মাসিমা মাসিমা বলিস। আমরা এখানে পাঁচজন বসে আছি, মাসিমা বললে কে সাড়া দেবে?'

দ্বিতীয়জন বললেন, 'মাসিমা ওয়ান মাসিমা টু করে নাও।'

'না না। মাসিমা মানে মায়ের বোন। তার মানে সম্পর্কটা আর একজনকে কেন্দ্র করে হল। কী দরকার। তুই আমাদের দিদি বলবি। নাম ধরে দিদি।'

অবন্তী লজ্জা পেল 'সেকী? আপনারা আমার কত বড়!'

'কী মেয়ে গো! দেখেছ তোমরা? আমাদের বড় বানিয়ে নিজে ছুঁড়ি সেজে থাকতে চাইছে। ওই তো, তোর মাথায় এক আধটা চিকচিক করছে, করছে না? তা ছাড়া তুই বিয়ে করিসনি, তুই আমাদের বোন।'

নলিনী বললেন, 'ঠিক কথা। আমি তবু আপেল খেয়েছি। সেটা টক না মিষ্টি তা বুঝেছি, তুই তো সেসব বুঝলি না।'

তৃতীয়জন বললেন, 'স্বাদের কথা যখন উঠল তখন বলি, রোজ আর কাটাপোনা খেতে ইচ্ছে করছে না ভাই।'

চতুর্থজন বললেন, 'এত করে বলি একটু ঝাল দিও, তবু ঠাকুর কথা শোনে না।'

প্রথমজন বললেন, 'তুই থাম। সারাজীন ঝাল খেয়ে খেয়ে পেটে ঘা করেও নোলা গেল না। ডাক্তার সাহেবের দোষ নেই। উনি পুরুষমানুষ, রান্নার ব্যাপার কী করে বুঝবেন। আমরা আগ বাড়িয়ে দেখাতে গেলে ঠাকুরের আবার গোঁসা হয়। তুমি স্বাদটা বদলে দাও।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

নলিনী বললেন, 'আমি তো নিরামিষ, একটু বড়ি দিতে বোলো তো।'

প্রথমজন বললেন, 'এই মেয়েটা, নলিনীদিকে বোঝা তো, কেন মাছ ডিম খাবে না? যে স্বামী চিরকাল জ্বালিয়ে গেল তার জন্যে উনি ওসব ছেড়েছেন কারণ তাঁর আত্মার অকল্যাণ হবে। কোনও মানে হয়? আমি তো সব খাই। এ যুগে ওসব কেউ মানে?'

নলিনী বললেন, 'আসলে তোমরা বোঝ না। না খেয়ে খেয়ে এখন নাকে খুব গন্ধ লাগে।'

অবন্তী বলল, 'আপনি ডিম খেতে পারেন। ঝোলে গন্ধ লাগলে পোচ বা ওমলেট খাবেন। জানেন তো, ডিম নিরামিষ।'

'ডিম নিরামিষ?' নলিনীর চোখ বড় হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। মাছের গায়ে মুরগি বা পাঁঠার গায়ে মাংস থাকে বলে ওগুলো আমিষ। ডিমে মাংস নেই। তাই নিরামিষ।'

'তা হলে তো পেঁয়াজ রসুন ও নিরামিষ?' দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চয়ই। একই মাটির তলায় আলুর মতো ওগুলো জন্মায়।"

'তা হলে যে বলে ওসব থেকে শরীর গরম হয়!'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির তুবড়ি ফাটল। প্রথমজন হাসতে হাসতে বললেন, 'ও করুণা, বাহাত্তরে এসে যদি তোর শরীর গরম হয় হোক, আমি জল ঢেলে ঠাণ্ডা করে দেব।' হাসি যেন আর শেষ হয় না।

অবন্তী বলল, 'আপনারা গল্প করুণ, আমি যাই।'

নলিনী বললেন, 'আজকে একটু কুলের টক কোরে তো। নিশ্চয়ই কুল উঠে গেছে বাজারে।'

'ঠিক আছে, করব।'

সোজা রান্নাঘরে চলে গেল অবন্তী। ঠাকুর ততক্ষণে উঠে পড়েছে। এখানে গ্যাসেই রান্না হয়।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিভাই, আপনি?'

'আজ কী রান্না করছ ঠাকুর?'

'ভাত ডাল বেগুনভাজা বাঁধাকপির তরকারি আর মাছের ঝোল।'

'বাঁধাকপির তরকারিটা প্লেন করছ?'

'কী করব দিদিভাই। কয়েকজন নিরামিষ খায়—।'

'এক কাজ করো। যাদবকে বলে দিচ্ছি, না, আমিই আজ বাজারে যাব। যারা নিরামিষ খায় তাদের জন্য বেগুন ছাড়া আলুভাজা করো। আর একটা তরকারি। বাঁধাকপিতে মাছের মাথা দিয়ো।'

ঠাকুর মাথা নাড়ল।

'ব্রেকফাস্টে কী দিচ্ছ?'

'হালুয়া।'

'কালও তো তাই করেছিলে। আজ চিঁড়েভাজা করো। বাদাম দিয়ে। সঙ্গে লুচ্চাস গোটা পুড়িয়ে দিয়ো। যে ঝাল খায় না সে বাদ দিয়ে খাবে।'

অফিস ঘরের দিকে চলল অবন্তী। এ ব্যাপারে তার একটা বড় সংকোচ আছে। ছেলেবেলায় তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়নি। যৌবনের শুরু থেকেই পেয়িংগেস্ট অথবা হোস্টেলে থেকেছে। রান্না সম্পর্কে তার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। অফিসে অনেক মেয়েকে রান্নার গল্প করতে শুনত। কারও কারও বাড়িতে গিয়ে খেয়েছে সে, একেবারে শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে সেগুলো। আজ সেজন্যে আফসোস হচ্ছিল। যদি সে একটু রান্না করতে জানত তা হলে এইসব বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে খাইয়ে খুশি করতে পারত।

'গুড মর্নিং।' ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে অবন্তী দাঁড়াল।

'গুড মর্নিং। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই সকালে বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের কটেজের সামনে, 'খুব ব্যস্ত?'

'না। বলুন, কিছু করতে হবে?'

'পিওন এলে একটু খবর দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি দিল্লিতে একটা বইয়ের অর্ডার দিয়েছিলাম। এখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই। সেলিম আলির পাখির ওপর বই। এখানকার গাছে গাছে প্রচুর অচেনা পাখি আসে। ওদের চিনতে চাই।'

'আমি সোষ্টঅফিসে গিয়ে খোঁজ করব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মাই গার্ল।' অমিয় নন্দী খুশি হলেন।

হেসে ফেলল অবন্তী। বেশ মজা লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল এখনও কেউ তাকে গার্ল বলে সম্বোধন করছে।

যাদব এই আশ্রমে প্রথম থেকে আছে। ডাক্তার সাহেব ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'চিনি মাটিতে পড়লে পিঁপড়ে আসবে, মাড়োয়ারি চান্স পেলেই ব্যবসা করবে, বাঙালি দুজন থেকে তিনজন হলেই দল তৈরি হবে আর কাজের লোক বাজারে গেলেই চুরি করবে বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু যে সামান্য ব্যতিক্রম চোখে পড়ে তার মধ্যে একজন শ্রীমান যাদব। ইনি চোর নন।'

যাদব দাঁত বের করেছিল, 'চুরি করব কার? নিজের জিনিস কেউ চুরি করে নাকি। ডাক্তার সাহেব আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন, এখানকার সব কিছু তাই আমারই।'

যাদব দাঁড়িয়েছিল। অবন্তীকে দেখে বলল, 'বড্ড ঝামেলা হচ্ছে।'

'কী রকম?'

'এখনও পালংশাকের শরীরের ভাল করে রস আসেনি অথচ একচক্ষু বাবু পালং রাঁধতে বলছেন।'

রাঁধতে বলছেন।'

'এক চক্ষু বাবু?'

'তিন নম্বর কটেজের বোর্ডার। খাই খাই স্বভাব। রোজ দুবেলা দেখবে পালং কত বড় হল, লাউগুলো খাওয়া যায় কিনা!'

'বাজারে পালং ওঠেনি?'

তা আজ্ঞে উঠেছে।'

'আজ নিয়ে এসো। পালংশাকের তরকারি হবে।' অবন্তী বলল, 'আর হ্যাঁ, কাটাপোনা ছাড়া অন্য মাছ পাবে না?'

'চুনো মাছ? অর্ধেক লোক খাবে না।'

'গুরজালি, ভেটকি—'

'বলছেন যখন দেখব। আপনার চা এসে গেছে।'

যে মেয়েটি চা নিয়ে এল সে স্থানীয় মানুষ। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, 'ওর স্বামী ওকে নেয় না। না নেবার কারণ শুনলে অবাক হবে। মদ্যপান করে স্বামী যদি ওর সঙ্গে সহবাস করতে আসে তা হলে ও আপত্তি করে। শুধু এই কারণেই বীরপুঙ্গব ওকে ত্যাগ করেছে। ওর বাবা মা ওকে অনেক বুঝিয়েছে। পুরুষমানুষের এটা অপরাধ নয়! এটি এত নির্বোধ যে বোঝেনি। ফলে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছে। মেয়েটি মন্দ না তবে মাঝে মাঝে উদাস হয়ে পড়ে। তুমি লক্ষ কোলে সে সময় যেন যাদব ওর সামনে না যায়।'

'সে কী? যাদব তো ভাল মানুষ বললেন।'

'উঁহু। বলেছি সৎ মানুষ, চোর নয়। তাই বলে তার অন্য কোনও দুর্বলতা থাকবে না এমন কথা বলিনি।'

'তা হলে তো মুশকিল হল। ওরা থাকে ভেতর দিকে, এক কাজ করা যায়, ঠাকুরকে বলে দেব?'

'না তার দরকার নেই। বেশিরভাগ সময় সরস্বতী ওকে পাত্তা দেবে না। শুধু ওই উদাস হওয়ার সময়টায় যা ভয়।'

ট্রেতে এককাপ চা প্লেটে ঢেকে নিয়ে এসেছে সরস্বতী সঙ্গে অন্য প্লেটে বিস্কুট। অফিস ঘরের টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'সবাই চা খেয়েছেন?'

'মতির মা দিতে গিয়েছে।'

'একটু দাঁড়াও।' সসরস্বতীকে অপেক্ষা করতে বলে অবন্তী যাদবকে টাকা দিয়ে বিদায় করল। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'এখানে ভাল লাগছে তোমার?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সরস্বতী।

' কেউ বিরক্ত করে না তো?'

'না। মতির মা শুধু ভুল ধরে।'

'ভুল হলে তো বলবেই। তাছাড়া মতির মা তোমার মায়ের বয়সী। ওর কথায় তুমি রাগ কোরো না।'

'না না রাগ করিনি।'

'মাঝে মাঝে তোমার মন খারাপ হয়, না?'

সরস্বতী মুখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকাল।

"শোনো, যখনই তোমার অমন লাগবে আমার কাছে চলে এসো। তখন তোমায় কোনও কাজ করতে হবে না। মনে থাকবে?'

মাথা নাড়ল সরস্বতী। ওর ঠোঁট হাসি ফুটল।

'কিছু বলবে?'

'আপনি খুব ভাল।'

চা শেষ করে প্লেট কাপ এগিয়ে দিয়ে অবন্তী বলল, 'তুমিও খুব ভাল।'

ওগুলো নিয়ে সরস্বতী গেলে খাতাপত্র নিয়ে বসল অবন্তী। প্রতিদিনের হিসেব, চিঠিপত্রের জবাব লিখতে হয়। এই নতুন জীবন তার খুব ভাল লাগছে। এত স্নেহ-ভালবাসা সামান্য ব্যবহারের জন্যে পাওয়া যায় তা তার ধারণায় ছিল না। সারাজীবন তাকে দু হাতে দিয়ে আসতে হয়েছে। বিনিময়ে কেউ তার গায়ে মমতার হাত বোলায়নি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক অবন্তী চায়নি। কিন্তু! সেসব এখন মন থেকে মুছে যাচ্ছে। এইসব বৃদ্ধবৃদ্ধারা সবাই এখানে এসেছিলেন প্রচণ্ড একাধিকত্ব নিয়ে। এসে বেশিরভাগই বন্ধু খুঁজে নিয়েছেন। কেউ আর একা নন। এমনকী যেসব গোমড়ামুখো বৃদ্ধ এখানে আছেন তাঁরাও একটু একটু করে বদলে যাচ্ছেন।

'মে আই কাম ইন?'

অবন্তী তাকাল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আসুন আসুন মেসোমশাই ভেতরে আসুন।'

পায়ে মোজা এবং কাপড়ের জুতো, পরনে সাদা হাফপ্যান্ট আর কলার তোলা গেঞ্জি, হাতে, লাঠি, বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। অবন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কতটা গিয়েছিলেন।'

'ফিক্সড রুট। চিড়িয়াখানার গেট পর্যন্ত। ফিক্সড রুটে যাওয়ার সুবিধে হল কত মাইল হাঁটলাম বোঝা যায়।'

'বলুন, কী করতে পারি?'

'আমার কটেজটা পাল্লাতে চাই।'

'কেন? কোনও অসুবিধে হচ্ছে।'

'মারাত্মক। কাল রাত্রেও ভাল ঘুম হয়নি।' বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন, 'মনে কোরো না আমি ওঁর বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছি। নালিশ করা আমার স্বভাব নয়। আফটার অল হি ইজ এ ডিস্টেন্ট ম্যান। পড়াশুনা আছে এবং রসিকতা করলে বুঝতে পারেন।। আই টোল্ড হিম, এক জীবনের আমি যা দেখেছি আপনি এত বই পড়েও তা অ্যাসেস করতে পারবেন না। এবং উনি যথেষ্ট ভদ্রলোক বলে তর্ক করেননি, মেনে নিয়েছেন।

'তা হলে অসুবিধে কোথায়?'

'কথা দাও, কাউকে বলবে না?'

'না। কথা দিচ্ছি।'

'ওঁকেও না।'

'ঠিক আছে।'

'প্রচণ্ড নাক ডাকে ওর। যখন পাশ ফিরে ঘুমোন তখন টিকা আছে। কিন্তু চিত হলেই বাঘের ডাক শুরু হয়ে যায়। এটা উনি জানেন। আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছেন সমস্যাটার সমাধান কীভাবে করা যায়! আমি যা জানি বলেছি, কিন্তু চিত হলেই কাজ দেয় না সেগুলো। এবং তুমি একটা ঘুমন্ত মানুষকে দড়ি দিয়ে বেঁধে না রাখলে চিত হওয়া আটকাতে পারো না।'

অনেক কষ্টে হাসি চাপতে পারল অবন্তী, 'এই অসুবিধে ডাক্তার সাহেবকে জানিয়েছিলেন?'

'নো।'

'কেন?'

'ডাক্তার সাহেব আর উনি খুব ক্লোজ ছিলেন। ঠিক বলে দিতেন ওঁকে।' বৃদ্ধ বললেন। ঠিক আছে, আমি আজই আপনার কটেজ পাল্টে দিচ্ছি।'

'নো।'

'তার মানে?'

'তুমি যদি কোনও কারণ না দেখিয়ে পাল্টে দাও তা হলে উনি ঠিক অনুমান করবেন আমি কমপ্লেইন করেছি। আরে ওঁর তো কোনও দোষ নেই। ঘুমন্ত মানুষ কী করে জানবে? তুমি বরং অন্য কোনও অজুহাত খুঁজে বের করো। বুঝেছ?'

'চেষ্টা করব।'

'ওয়েল, কেমন লাগছে এখানে এসে।' বৃদ্ধ উঠলেন।

খুব ভাল।'

'ডাক্তার এলে বোলো তো আমার কাছে যেতে।'

'মাঝে মাঝে যা না। বলে অফিসে নোট না করালে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। কথাটা ঠিক। যে সুস্থ তার কাছে অনর্থক কেন যাবে!' বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন।

কী করে সমস্যার সমাধান করা যায়?

'এই যে মেয়ে। এসব কী হচ্ছে? আশ্রমটা তো নরক হয়ে যাবে এবার।' বলতে বলতে বেঁটেখাটো এক বৃদ্ধা ঢুকলেন।

'কী হয়েছে মাসিমা?'

'শুনলাম আমাদের পেঁয়াজ রসুন খাওয়াবে। শরীর গরম হলে গায়ে জল ঢেলে দেবে। কথাটা তোমার মুখ থেকে শুনতে এলুম।'

'আপনার যা ইচ্ছে তাই খাবেন।'

'তার মানে কথাটা সত্যি নয়?' চোখ ছোট করলেন বৃদ্ধা।

'যার ইচ্ছে তিনি ওগুলো খেতে পারেন। যিনি ভাবছেন কী করবেন তিনি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। আর আপনার মতো যাঁরা খাবেন না বলে সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছেন তাঁদের কোনওভাবেই বিব্রত করা হবে না।' অবন্তী বলল।

'দেখেছ করুণাটার কাণ্ড। আমাকে একেবারে মিথ্যে কথা বলল? আর আমারও মরণ হয় না, যত বয়স হচ্ছে তত কান পাতলা হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ সুখলতা মাসি খুব ঝগড়ুটে!'

'না না। আপনি তো কোনও অন্যায় বলেননি।'

'তোমার সঙ্গে কথা বললে মন জুড়িয়ে যায়। আঠারো বছরে বিয়ে হয়েছিল। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এলুম। খুব গোঁড়া বাড়ি। কেউ কেউ বাবাকে বলেছিল মেয়ের আবার বিয়ে দাও। বাবা বলল, দোজবরের সঙ্গে দেব না, অবিবাহিত পালটি ঘর হলে ভেবে দেখব। সেরকম প্রস্তাব তাঁর জীবদ্দশায় আসেনি। মা বলল, মেয়ে আমার নিরামিষ খাবে, আমি কী করে মাছ মাংস মুখে তুলি! বাবা বলল, আজ থেকে এ বাড়িতে নিরামিষ। চলো, আমরা সবাই অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম থেকে দীক্ষা নিয়ে আসি। গেলাম সবাই দেওঘরে। সেই বয়স থেকে পেঁয়াজ রসুন খাচ্ছি না। এই মরার আগে যদি শুনি ওগুলো খেতে হবে তা হলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে? বলো?'

'নিশ্চয়ই না।'

'তবে হ্যাঁ, ঠাকুর ব্যাটা বড্ড ঝাল কম দেয়। বিধবার জিভে ঝাল ছাড়া আর কীসে স্বাদ আসবে বলো? চলি, আমার ঠাকুরের বিছানা তোলা হয়নি। পোড়া কপাল, ঠাকুর সেবার আগে নিজের নোলার কথা ভেবে মরছি।' বৃদ্ধ চলে গেলেন।

বিকেল বেলায় লাইব্রেরিতে গিয়েছিল অবন্তী। যে বৃদ্ধা লাইব্রেরি দেখাশোনা করেন তাঁর নাম বনানীমাসিমা। তিনি অনুযোগ করলেন, 'মেয়েরা এত বই পড়ে বুঝলে, আমি তো সাপ্লাই দিয়ে শেষ করতে পারছি না। চোখের বারোটা বেজে গেছে, চশমার পাওয়ার এত এত, তবু বই পড়া চাই।'

'ভাল তো।'

'ভাল? বছরে পাঁচ হাজার টাকার বেশি বই কিনতে পারি না। ওটাই বাজেট। ডাক্তার সাহেব

অনেক চেষ্টায় এই টাকার ব্যবস্থা করেছেন। আজকাল বই-এর যা দাম বেড়েছে পাঁচ হাজার টাকায় কটা বই হয়?'

'আপনি খুব পড়েন, না?'

'কোথায় আর পড়ি। পৃথিবীর কত বই পড়া হল নাই ইংরেজি যদি ভাল জানতাম—!' বনানীমাসির নিশ্বাস পড়ল।

'এর কোনও শেষ নেই বনানীদেবী।' অমিয় নন্দী বই হাতে ঘরে ঢুকলেন। 'আমি ফ্রেঞ্চ জানি না, জানলে ওদের সাহিত্য পড়তে পারতাম। আবার ফ্রেঞ্চ জানলে রাশিয়ান লিটারেচার সম্পর্কে হাহুতাশ করতাম। বইটা ফেরত নিন।'

বনানী মাসিমা যখন খাতায় লেখালেখি করছেন তখন নলিনী মাসিমার নেতৃত্বে কয়েকজন বৃদ্ধা হইহই করে ঢুকলেন, 'এই যে মেয়ে, আজ তোমাকে ছাড়ছি না।'

'কেন? আমি কী করলাম?'

'খুব অন্যায় করেছ!' সুখলতা মাসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খবরটা আমাদের কাছে চেপে গেছ। এবার একটা আবৃত্তি শোনাও।'

'না না—।' আপত্তি করল অবন্তী।

কিন্তু ওঁরা কেউ কথা শুনতে চাইলেন না। অমিয় নন্দী বললেন, 'তাহলে, আমার প্রস্তাব, খোলা আকাশের তলায় হোক। আজ চাঁদ উঠবে। কাল পূর্ণিমা।'

সবাই হই হই করে বেরিয়ে এল। দেখতে দেখতে অন্য কটেজের বাসিন্দারা সেই ভিড়ে ভিড় বাড়াল। অবন্তী বলল,'অনেক দিন বলি না। আপনারা বলছেন বলে কিন্তু নলিনী মাসি, আপনাকে গান শোনাতে হবে।'

সবাই চিৎকার করে কথাটাকে সমর্থন করল। শুধু দূরে দাঁড়ানো ধ্রুবজ্যোতিবাবু চাপা গলায় বললেন, 'আমার আপত্তি আছে।'

তখন আলো মরে এসেছে কিন্তু চরাচর জীবন্ত করতে চাঁদ উঠে বসল একটু আগেই। এখনও তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছায়নি। কীরকম আদুরে আদুরে হয়ে গেল পৃথিবীটা। অবন্তী চোখ বন্ধ করল। তারপর লাইনগুলো ভেবে নিয়ে আবৃত্তি শুরু করল, 'সারাদিন মিছে কেটে গেল; সারারাত বড্ড খারাপ/ নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে; জীবন/দিনরাত দিনগতপাপ।' আবৃত্তি শেষ হতেই বনানীমাসি বললেন, ' না দিদিভাই, এ তো মন খারাপের কবিতা। মন ভাল করার একটা না বললে তোমার নিস্তার নেই। কী ভাল গলা।'

সবাই সোল্লাসে সমর্থন করল বনানীমাসিকে।

'আজকে অনেক দিন পরে আমি বিকেলবেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে ;
শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে—নেভো।'

কবিতা যখন শেষ হল তখন চাঁদ বিছিয়ে দিয়েছে জোছনা। গাছের পাতায় চিরুনির মতো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। নলিনীমাসি আচমকা গান ধরলেন, 'আজ তোমাকে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।' হয়তো সুর ঠিক হচ্ছিল না, স্কেল পাল্টে যাচ্ছিল কিনতু আবেগ সব কিছু আড়ালে রেখে দিয়েছিল। তিনি থামতেই ধ্রুবজ্যোতিবাবু গান ধররেন, 'আহা চন্দ্রমুখীরে দেখি চন্দ্র কেন মুখ ঢাকে।' তাঁর কণ্ঠ এখনও পরিশীলিত, কাজগুলো স্পষ্ট।

সন্ধেটা কেটে গেল চমৎকার। শেষপর্যন্ত অবন্তী হাতজোড় করল, 'রাত হয়েছে। এবার খেতে যেতে হবে। বেচারারা সারাদিন পরিশ্রম করেছে, এবার ওদের ছুটি দেওয়া দরকার।'

এ আসার ভেঙে উঠে যেতে কারও তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যেতে হল, অবন্তীকে ঘিরে বলতে লাগল, 'এমন আনন্দ আগে কখনও পাইনি দিদিভাই। তুমি শতায়ুহ ও অবন্তী কপট রাগ দেখাল, 'অভিশাপ দিচ্ছেন।'

'না দিদিভাই। মন থেকে বলছি।'

ওঁরা যখন খাওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখণ বৃদ্ধ সামনে এলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, মর্নিং ওয়াকার আমার কটেজের পাশ থেকে উঠে অন্যদিকের কটেজে গেল কেন?'

অবন্তী ঢোঁক গিলল, 'আপনাকে উনি কিছু বলেননি?'

'বলেছেন। সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'কী বলেছেন?'

'তুমি নাকি ওঁকে শিফট করতে বলেছে।'

'ঠিকই বলেছেন উনি। আসলে উনি তো খুব ভোরে ওঠেন, রাত্রের ঘুমও বেশ পাতলা। এখন যার পাশে গিয়েছেন সেই সুবোধ মেসোমশাই-এর শরীর ভাল নয়। ডাক্তারবাবু বলেছেন কাছাকাছি কারও রাত্রে দরকার। আমি চেয়েছিলাম যাদব ওঁর কটেজে রাত্রে থাকুক। কিন্তু সুবোধ মেসোমশাই কিছুতেই রাজি নন। তখন ওঁকে পাশের কটেজে নিয়ে গেলাম। তেমন প্রয়োজন হলে উনি ঠিক জানতে পারবেন।'

বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটল, 'তাই বলো। তা এই কথাটা আমায় খুলে বললেই হত। আমি অবশ্য ওঁকে বুঝতে দিইনি যে অবিশ্বাস করেছিলাম।'

'খুব ভাল করেছেন। চলুন খেয়ে নেবেন।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বৃদ্ধ নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা তুমি তো সবে কলকাতা থেকে এলে। নাক ডাকা বন্ধের কোনও ওষুধ বেরিয়েছে কিনা জানো?'

'না মেসোমশাই। তবে আমি একজন বিখ্যাত ই, এন, টি স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে চিনি। তাঁকে চিঠি লিখে জানাতে পারি।'

'প্লিজ।'

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল অবন্তীর। বুকের ভেতর প্রচণ্ড চাপ, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসল। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে চাইল। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে বাইরে এল। জ্যোৎস্না যেন ফিনিক দিয়ে উঠেছে। চারপাশ অপূর্ব মায়াময়। পৃথিবীটা চুপচাপ। শুধু রাতের একটা পাখি ডেকে উঠল আচমকা। নিশ্বাস স্বাভাবিক হলে অবন্তী মনে করার চেষ্টা করল সে কোনও স্বপ্ন দেখেছিল কিনা, মনে পড়ল না।

এখনই বিছানায় গেলে ঘুম আসবে না। অবন্তী হাঁটতে লাগল। ভর জ্যোৎস্নায় হাঁটলে কেমন ঘোর লাগে মনে। ঈশ্বরের উচিত মানুষের মরার সময়টা এমন চাঁদের আলোর রাতে নির্দিষ্ট করা।

হাঁটতে হাঁটতে বেদিটার কাছে চলে আসতেই কানে গান এল। ধ্রুবজ্যোতিবাবু। একা বসে গাইছেন, 'আজ তোমাকে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।' কী সুন্দর কণ্ঠ। এই গান নলিনীমাসি গেয়েছিলেন সন্ধের আসরে। ইচ্ছে হচ্ছিল নলিনীমাসিকে ঘুম থেকে তুলে এখানে নিয়ে এসে গানটা শোনাতে। অবন্তী সরে এল। ফেরার পথে কথাটা মাথায় আসতেই হেসে ফেলল সে। যতই রোমান্টিসিসম মনে থাকুক এই কথাটা কানে গেলে নলিনীমাসি প্রচণ্ড রেগে যাবেন।

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর ডাক এল। কলকাতা থেকে ডাক্তারসাহেব জানিয়েছেন তিনি এখন অনেক ভাল আছেন। এর মধ্যে আশ্রমে থাকবার জন্যে যেসব আবেদনপত্র এসেছিল তাঁদের ইন্টারভিউ নিয়ে তিনি দুজনকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁদের চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং আশ্রমে পৌঁছালে যা করার তা যেন অবন্তী। করে।

ডাক্তারসাহেব ভাল আছেন জেনে মনটা ভাল হয়ে গেল। ক্যানসার এখন আগের মতো তীব্র ভয়ংকর নয়। লড়াই করার সময় পাওয়া যায় যদি প্রথম স্তরে জানা যায়। অবশ্য পরিণতি একই তবু যেটুকু সময় বাড়তি পাওয়া যায় সেটুকুই লাভ।

প্রথমে যে ভদ্রলোক এলেন তার নাম আর কে মিত্র। ডাক্তারসাহেবের চিঠি টেবিলে রেখে বললেন, 'একটা জিনিস আমার জানা হয়নি। আপনাদের কটেজে কমোড আছে তো?'

'দুধরনের ব্যবস্থা আছে। আপনার কমোড দরকার হলে সেইরকম কটেজেই আপনাকে দেওয়া হবে।'

'আসলে আমার ডান পা আমি মুড়তে পারি না।'

'ও।' ভদ্রলোককে দিয়ে কয়েকটা ফর্ম ভর্তি করিয়ে সই করল অবন্তী।

'এখানে তো মহিলারাও থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'শান্তিতে থাকা যাবে তো?'

'আপনার মনে হচ্ছে মহিলারাই অশান্তির কারণ হন?'

'আমি ঠিক তো বলতে চাইছি না। তবে।'

'আপনি ডাক্তারসাহেববে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন?'

'আমি ভেবেছিলাম ওঁদের আলাদা থাকার জায়গা গেটে দেখলাম সবাই একসঙ্গে ঘুরছেন। ম্যানেজার যখন আপনি তখন—।'

'আপনি স্থির করুণ কী করবেন?'

'ঠিক আছে। দেখা যাক। অসুবিধে হবে এই আশ্রম ছেড়ে যেতে তো কোনও অসুবিধে নেই।'

ভদ্রলোককে নতুন কটেজে ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে ডাক্তারসাহেবকে ব্যাপারটা জানিয়ে চিঠি লিখল অবন্তী। সেইসঙ্গে নবাগতের নামে খাতা তৈরি করে ওঁর সম্পর্কে যা লেখার লিখে এটিও সংযোজন করল। অবন্তীর মনে হল এই ভদ্রলোক খুব শিগগির সমস্যা তৈরি করবেন।

পরদিন অপিস ঘরে বসে কথা বলছিলেন অমিয় নন্দী এবং ধ্রুবজ্যোতিবাবু। তাঁরা নবাগতের প্রশংসা করছিলেন। চমৎকার বেহালা বাজান নাকি ভদ্রলোক। এইসময় রিকশা এল। অবন্তী দেখল পাকা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক রিকশা থেকে নামছেন। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। মাথায় টাক।

অমিয়বাবু বররেন, 'আমাদের আর একজন মেম্বার বাড়ল।'

জিনিসপত্র রিকশাওয়ালা নামিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর ভদ্রলোক অফিসঘরের দরজায় এরেন, 'আসতে পারি?'

'বিলক্ষণ। আসুন। ইতি আমাদের দিদিভাই। এরই দায়িত্বে আমরা আছি। বসুন। কথা বলুন।'

অবন্তী দেখল রোগা একটু কুঁজো হওয়া লোকটির ঠোঁট সামান্য হাসি এসেই মিলিয়ে গেল। তিনি চেয়ারে বসে একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি আবেদন করেছিলাম। আমাকে কলকাতায় কর্নেল সাহেব দেখা করতে বলেছিলেন। করেছিলাম। তারপর এই অনুমতিপত্র পেয়ে তাঁকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

খামটা খুলল অবন্তী। ডাক্তার সাহেবের অনুমতিপত্র। চিঠির ওপর নাম দেখে বুকে ড্রাম বাজাতে লাগল তার। এস সেনগুপ্ত, গুসকরা, বর্ধমান। ধ্রুবজ্যোতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথকে আসছেন?'

'গুসকরা।'

'কী করা হত?'

'স্কুলে পড়াতাম।'

'সংসারে কেউ নেই নিশ্চয়ই।'

'নাঃ। মা ছিলেন। দশ বছর আগে চলে গেছেন।'

'গানটান করা হয়?'

'না। সে গুণ নেই।' তারপর অবন্তীর দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করতে হবে আমাকে?'

কয়েকটা ফর্ম বের করে অবন্তী বলল, 'এগুলো ভর্তি করে সই করুন। আশ্রমের নিয়মাবলি কটেজের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে, দেখে নেবেন। এ মাসের টাকা যখন দেওয়া হয়ে গেছে তখন সামনের মাসেরটা তিন তারিখের মধ্যে দিলেই চলবে।'

ফর্মগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে লিখতে লাগলেন। সই করে ফিরিয়ে দেওয়ার পর অবন্তী নজর বোলাল। দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর পর কাকে খবর দিতে হবে কলমটায় উনি কেটে দিয়েছেন।

যাদব ঘরে ঢুকল। বাজারের হিসেব দিতে এসেছে সে। অবন্তী তাকে বলল, 'শোনো, ওঁকে তেত্রিশ নম্বর কটেজে নিয়ে যাও। যা লাগবে তার ব্যবস্থা করে দাও যাদব। ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যেতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি তা হলে যাই।' সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবু উঠলেন, 'চলুন আপনার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।' ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

' তোমাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন দিদিভাই?' ধ্রুবজ্যোতিবাবু জিজ্ঞসা করলেন, ' লোকটার বয়স ষাটের মাঝামাঝি কিন্তু বেশ অসুস্থ দেখাল। তাই ভাবছ ঝামেলা বাড়ল?'

'না। ঝামেলা মনে করলে এখানে আসব কেন? আজ রাত্রে দুধরনের চাউমেন করতে

বলেছিলাম। চিকেন আর নিরামিষ। কিন্তু যাঁরা নিরামিষ খান তাঁরা চাউমেন খেতে চাইছেন না।

'কেন?'

'ভাবছেন ওতেও আমিষ থাকে।'

'রুটি আর পালং-শাকের ঘন্ট খাওয়াও ওঁদের।'

ধ্রুবজ্যোতিবাবু চলে গেলে চোখ বন্ধ করল অবন্তী। এটা কী করে হল? কত বছর দেখা নেই, যোগাযোগ নেই তবু ঠিক এখানে কী করে উপস্থিত হল স্বর্ণেন্দু? চিঠিটা না দেখলে সে চিনতেই পারত না মানুষটাকে। অত বড় টাক, দাড়ি একেবারে অন্য চেহারা করে ফেলেছে স্বর্ণেন্দু। এখানে যদি অন্য নামে আসত তা হলে বুঝতেই পারত না অবন্তী।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে এখানে এল কেন? ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে গেল মনটা। স্বর্ণেন্দু কি তার সব খবর রাখত? একটা লোক তার অজান্তে ছায়ার মতো পেছনে ঘুরেছে ভাবতেই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল অবন্তীর।

এখন কী করা যায়? এই আশ্রমে একসঙ্গে থাকলে নিত্য দেখা হবে। অনেক ভাগ্য, অফিসে ঢুকে স্বর্ণেন্দু তিরিশ বছর আগের সম্পর্ক ধরে কথা শুরু করেনি। কিন্তু পরে করবে না তা কে বলতে পারে! সারাক্ষণ অস্বস্তিতে কাটল তার।

কাল সারাদিন ইচ্ছে করেই অফিসরুমের বাইরে যায়নি অবন্তী। যিনি এসেছেন তাঁকেই বলেছে, অনেক কাজ জমে গেছে, শেষ করতে হবে।

সকালবেলায় যাদব এল বাজারে যাবে বলে। তার সঙ্গে যখন কথা বলছে অবন্তী তখন স্বর্ণেন্দুর গলা শুনল, 'আসতে পারি?'

'বলুন!'

'আমি কি আশ্রমের কোনও কাজে লাগতে পারি?'

'মানে?'

'আসলে ঘরে বসে ভাল লাগছে না। আমাকে যে কোনও কাজের দায়িত্ব দিতে পারেন। যেমন বাজারে যাওয়া, বাগান করা, ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে যাওয়া। সময়টা কেটে যাবে।'

'সময় কাটাতে অন্য জায়গায় অনেক কাজ ছিল, তাই না?'

'ছিল। কিন্তু সেখানে অসুস্থ হলে কেউ পাশে দাঁড়াত না। কর্ণেল সাহেব সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

' দেখুন, আমাদের বাজার যাদব করে। বাগান দ্যাখে কানাই বলে একজন। ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিসে আমি যাই।'

এবার যাদব বলল, 'উনি যখন বাজারে যেতে চাইছেন চলুন না।'

'যান তা হলে।'

স্বর্ণেন্দু বাজারে গেল যাদবের সঙ্গে।

এই- যে গায়ে পড়ে কাজ করতে চাওয়া পছন্দ হল না অবন্তীর। কাজের ছুতোয় তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। অবন্তী ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে।

দুপুরের শেষ দিকে সে বের হল। এইসময় সবাই যে যাঁর কটেজে থাকেন। চারপাশ ফাঁকা। তেত্রিশ নম্বর কটেজের সামনে পৌঁছে সে ডাকল, 'শুনছেন?'

এক ডাকেই বেরিয়ে এল স্বর্ণেন্দু আপনি একটু আসুন, কথা আছে।'

'ভেতরে আসুন।'

'না। সেটা শোভন নয়, এখানে একটা বেদি আছে, আসুন।'

আশে পাশে কেউ নেই। স্বর্ণেন্দু এলে অবন্তী সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে ডিস্টার্ব করে আপনি কী আনন্দ পাচ্ছেন?'

'আমি ডিস্টার্ব করছি বুঝতে পারিনি।'

'আপনি এখানে এলেন কী করে?'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, আশ্রম পরিচালনার জন্যে এঁরা সাহায্যকারী চাইছেন। আবেদন করেছিলাম। আমাকে জানানো হল চাকরিটা খালি নেই। তখন আশ্রম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। জেনে মনে হল এখানে এসে থাকা যায়। ব্যাস, এই পর্যন্ত।'

'আমি এখানে আছি জানা ছিল না?'

'না। তবে অনুমতিপত্রে লেখা ছিল আশ্রমে গিয়ে শ্রীমতী অবন্তী চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে। তখন অনুমান করেছিলাম।'

'আমি চাই না অতীতের কথা এখানকার কেউ জানুক।'

'প্রচার করার ইচ্ছে আমার নেই। তবে তেমন পরিস্থিতি হওয়ার আশংকা থাকলে আমি বরং এখান থেকে চলে যেতে পারি।'

অন্যমনস্ক হয়ে গেল অবন্তী। বলল, 'তার দরকার নেই।'

'তা হলে?'

'আর পাঁচজনের সঙ্গে কোনও পার্থক্য পাওয়া যাবে না আমার কাছে।'

'বেশ তো।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। এবার চলে যাওয়া উচিত। তবু জিজ্ঞাসা না করে পারল না অবন্তী, 'টাক তো প্রাকৃতিক নিয়মে পড়ে কিন্তু পাকা দাড়ি রাখা হল কেন?'

'আলস্য। দাড়ি কামাবার ইচ্ছে হয় না।'

'এলাম।' অবন্তী চলে এল।

সেদিন সন্ধের মুখে আসর বসেছিল, সে যেটা শুরু করেছিল সেটা এখন নেশার মতো হয়ে গেছে সবার। আজ চাঁদ উঠবে দেরিতে। কাজের দোহাই দিয়ে অবন্তী অফিস ঘরে ছিল। নলিনী মাসি তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এল, 'আরে আর কে মিত্র লোকটা কী সুন্দর গান গাইছে, শুনবে এসো। সায়গলের গান।'

আসতে হল। ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে পুরনো গান গাইছেন, ধ্রুবজ্যোতিবাবুকে দেখা গেল তারিফ করতে। এরপর সবাই স্বর্ণেন্দুকে ধরল, কিছু একটা করতে হবে। স্বর্ণেন্দু বলল, 'আমি কিছুই জানি না।" কিন্তু এটা কেউ শুনতে চাইল না। স্বর্ণেন্দু উঠে দাঁড়াল। তারপর আবৃত্তি করল। কবিতার নাম শুনে ধক্ করে উঠল অবন্তীর বুক। স্বর্ণেন্দু আবৃত্তি করে যাচ্ছিল। জীবনানন্দের শব্দগুলো একটার পর একটা ছবি তৈরি করে ধরছিল অবন্তীর বন্ধ চোখের পাতায়। চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে সোনালি সোনালির দল শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে/কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে।'

অবন্তী ধীরে ধীরে সরে এল। এখন চারপাশে ছায়া জড়ানো আলো, অস্পষ্ট অথচ রহস্যময়। হাঁটতে অসুবিধে হয় না। দুপাশের গাছগুলো নড়ছে, নড়াচড়া করছে। বুকের মধ্যে বাজল লাইনগুলো,'হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে/সরু-সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার/ শিরিশের অথবা জামের/ ঝাউয়ের-আমের; কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে।'

হঠাৎ বুক মুচড়ে কান্না এল। আধা অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে অবন্তী কেঁদে ফেললে। নিঃশব্দে। 'জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড় বছরের পার।'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে জানলার ওপাশে চাঁদ দেখতে পেল অবন্তী। শীর্ণ, ফ্যাকাশে। এই চাঁদ দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আচমকা কথাটা মনে এল। যে স্বর্ণেন্দুকে সে ভালবাসত তার সঙ্গে এখনকার স্বর্ণেন্দুর কোনও মিল আছে কি? না নেই। এই টাক মাথা পাকা দাড়ির মানুষটাকে সে কখনও ভালবাসেনি! সঙ্গে সঙ্গে আর এক মন বলল, তখন যদি বিয়ে হত, যদি একসঙ্গে এতকাল থাকা হত, আর ধীরে ধীরে স্বর্ণেন্দুর টাক পড়ত, দাড়ি পেকে যেত তা হলে কি সে ভালবাসত না? প্রথম মন বলল, সেই পরিবর্তনের সঙ্গী হয়ে থাকা এক ব্যাপার আর পরিবর্তিত চেহারা দেখা অন্য ব্যাপার।

কিন্তু লোকটা আশ্রমের ফর্মে লিখেছে সে আনম্যারেড। এই এতটা বছর যে মনুষ বিয়ে না করে থেকেছে তারও কোনও দরকার ছিল না। কোনও সাংসারিক কর্তব্য করার জন্যে বাধ্য হয়ে অবিবাহিতের জীবনযাপন করতে হয়নি ওকে। তা হলে বিয়ে করল না কেন?

এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল অবন্তী। সে এখন কী করবে? একই আশ্রমে কতকাল অভিনয় করে থাকবে? ডাক্তার সাহেবকে সব জানিয়ে আশ্রম ছেড়ে অন্য কোথাও

চলে যাবে? সে যাবে কেন? স্বর্ণেন্দু তো নিজেই চলে যেতে চেয়েছিল। একটি পুরুষের পক্ষে বাসস্থান খুঁজে নেওয়া যতটা সহজ কোনও মেয়ের পক্ষে ততটা নয়।

তারপরেই মনে হল কেন, কী দরকার? এই আশ্রমেই তো তারা বাকি জীবনটা থাকতে পারে? বন্ধুর মতো। এখন তাদের যে বয়স তাতে বাইশ বছরের প্রেমের উদ্দামতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। শরীরের চাহিদা চাপা দিতে দিতে কখন হারিয়ে গিয়েছে। ফুরিয়ে গিয়েছে। শরীরের চাহিদা চাপা দিতে দিতে দিতে কখন হারিয়ে গিয়েছে। প্রেমের উল্লাস এখন নেই। সামান্য দেখা, কথা বলা, একই চৌহদ্দিতে থাকা এটাই যথেষ্ট। না, কোথাও চলে যেতে হবে না স্বর্ণেন্দুকে। এইরকম ভাবতেই মনে আরাম এল। অবন্তী দেখল চাঁদ সরে গেছে জানালা থেকে।

দরজায় শব্দ হচ্ছিল। সেইসঙ্গে ডাকাডাকি।

চোখ মেলল অবন্তী। বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে সে দেখল যাদব দাঁড়িয়ে আছে, 'দিদিভাই, তাড়াতাড়ি চলুন।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'তেত্রিশ নম্বরের বাবু খুব অসুস্থ। বেদিতে শুয়ে আছেন।'

অবন্তী দৌড়াল। ওই ভোরেই বেদির সামনে ভিড় জমেছে। সে পৌঁছাতেই মর্নিং ওয়াকার বৃদ্ধ বললেন, 'আমিই প্রথম দেখি ইনি এখানে শুয়ে আছেন। ভেবেছিলাম রেস্ট নিচ্ছেন।'

'সরুন আপনারা।' অবন্তী এগিয়ে গেল। স্বর্ণেন্দু শুয়ে আছে চিত হয়ে। তার মুখে যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ। ডান হাত বুক আঁকড়ে আছে।

দিব্যজ্যোতিবাবু বললেন, 'এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

অবন্তী ছুটল। অপিসঘরে ঢুকে রিসিভার তুলল। বেশির ভাগ দিনই এটা মৃত থাকে। কিন্তু এখন সচল আছে। হাসপাতালে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স চাইল সে। যে ফোন ধরেছিল সে বলল, 'দিদি একটু দেরি হবে। এত ভোরে ড্রাইভারকে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে গেট পেরিয়ে পিচের রাস্তায় গেল অবন্তী। সুনসান রাস্তা। পাগলের মতো চারপাশে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। কী করা যায়। যাদব এসেছিল পেছন পেছন, 'হাসপাতাল কী বলল দিদি?'

'অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি হবে।'

'আমাদের সাইকেল ভ্যানটা করে নিয়ে যাব?'

'অনেকসময় লাগবে যাদব?'

'রাস্তায় যদি অ্যাম্বুলেন্সের দেখা পাই তো তুলে দেব।'

অবন্তীর মনে হল এছাড়া কোনও উপায় নেই। সে মাথা নাড়ল ।

যাদব চলে যেতেই অবন্তীর মনে প্রশ্ন এল। নিজের ঘরে না শুয়ে স্বর্ণেন্দু কি সারারাত বেদির ওপর শুয়েছিল? এখন তো রাতে একটু হিম পড়ে। তাও? কেন? স্বর্ণেন্দু কি ভেবেছিল সে রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে? পাগল! কিন্তু যেটুকু অনুমান তাতে স্বর্ণেন্দু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে। এখনই—! দূরে একটা কালো বিন্দুকে দেখতে পেল অবন্তী। এগিয়ে আসছে। গাড়ি! উত্তেজনায় মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো হাত মাথার ওপর তুলে নাড়তে লাগল সে।

সবজি ভ্যানটা দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে দিদি? ঝাড়গ্রাম যাবেন?'

'না ভাই, আমাদের আশ্রমের একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দয়া করে ওঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন ভাই?'

ততক্ষণে ভ্যানে চাপিয়ে যাদব স্বর্ণেন্দুকে নিয়ে এসেছেন গেটের কাছে। পেছনে অন্য আবাসিকরা। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার সবজি একপাশে সরিয়ে জায়গা করে দিল। স্বর্ণেন্দুকে সেখানে শুইয়ে দেওয়া হল। অবন্তু, যাদব এবং অমিয় নন্দী ভ্যানে উঠরেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে ওরা হাসপাতালে পৌঁছে গেল। সেই সময় অ্যাম্বুলেন্স বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তাকে নিশেষ করে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেল স্বর্ণেন্দুকে অবন্তী। স্বর্ণেন্দু ভর্তি হয়ে গেল।

সকাল দশার সময় আশ্রমের দশজন এল। এঁদের মধ্যে বনানী মাসি, নন্দিনী মসিরাও আছেন। বনানী মাসি বলরেন, 'দিদিতাই, তুমি আশ্রমে যাও। আমরা আছি। তুমি বিকেলে এসো।'

অবন্তী বলল, 'ডাক্তার বললেন আটচল্লিশ ঘন্টার আগে কিছু বলা যাবে না। খুব সিরিয়াস হার্ট

এ্যাটাক।'

'প্রার্থনা করব আমরা। নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন।'

ওঁরা জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিরেন অবন্তীকে। শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন চলে গেছে। আজ আশ্রমের বাজার হয়নি। রান্নার কথা বলা হয়নি ঠাকুরকে। সে খিচুড়ি করেছে। এ নিয়ে কেউ রাগারাগি করেনি। বেদির কাছে চলে এল অবন্তী কেন স্বর্ণেন্দু এসে শুয়েছিল এখানে। যাঁরা আশ্রমে ছিলেন তাঁরা বললেন, ওঁর বাড়িতে খবর দিতে। অবন্তী বলল, 'উনি লিখেছেন খবর দেওয়ার দরকার নেই কারণ কেউ নেই।'

'ওর কটেজে গিয়ে দ্যাখোনা দিদিভাই, যদি কোনও—!'

অতএব অবন্তী গেল। বাকিরা কটেজের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সামান্য জামাকাপড়, বইপত্র, টুকিটাকি। হঠাৎ নজরে এল বইটা। শেষের কবিতা। এই বই নিয়ে একসময় তর্ক হয়েছিল স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে। বইটি তুলল। দ্বিতীয় পাতায় স্বর্ণেন্দুর হাতের লেখা, 'তুমি লাবণ্য নও'।

বাতাসে বেরিয়ে এল বুক নিংড়ে। বইখানা রেখে দিল। বাইরে বেরিয়ে এসে মাথা নাড়ল সে, 'পেলাম না।'

দুপুরের একটু বাদে যাদব ফিরে এল। বিধ্বস্ত চেহারা।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অবন্তী। রোদ মাথায় নিয়ে। যাদবের মুখচোক দেখে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কখন?'

কেঁদে উঠল যাদব, 'একটু আগে।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল অবন্তী।

খবর পৌঁছে গেল কটেজে কটেজে। অবন্তী ছুটল হাসপাতালে।

স্বর্ণেন্দুকে নিয়ে লরিতে চেটে যখন ওরা ফিরে এল আশ্রমে তখন বিকেল। সবাই কাঁদছিল। বিশেষ করে মেয়েরা। অবন্তী স্থির। এর মধ্যে কলকাতায় টেলিফোন করার চেষ্টা হয়েছিল। লাইন পাওয়া যায়নি। স্বর্ণেন্দুকে অফিসঘরের সামনে খাটে শুইয়ে দেওয়ার পর লাইন পাওয়া গেল। কেউ একজন ডাকল অবন্তীকে, 'দিদিভাই, আপনি কথা বলুন।'

পুতুলের মতো হেঁটে এসে রিসিভার তুলল অবন্তী, 'হ্যালো!'

'কী ব্যাপার অবন্তী?' ডাক্তার সাহেবের গলা।

'একজন আবাসিক হৃদরোগে মারা গিয়েছেন।'

'সে কী? মাই গড! কে?'

'স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত। উনি সবে এসেছিলেন।'

হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল টেলিফোনটা। তারপর অন্যরকম গলায় ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাস করলেন, 'কোনও সুযোগ পাওয়া যায়নি?'

'না।'

'কাউকে খবর দিয়েছ?'

'উনি ফর্মের ওই জায়গাটা কেটে দিয়েছিলেন।'

'ভালভাবে শেষযাত্রার আয়োজন করো। আমি আগামীকাল যাচ্ছি।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখল অবন্তী। স্বর্ণেন্দুর নাম শুনে ডাক্তার সাহেব অতক্ষণ চুপ করে থাকলেন কেন?'

পাঞ্জাবি পরিয়ে দেওয়া হল, চন্দনের টিপ। কেউ কেউ আশ্রমের গাছ থেকে ফুল এনে সাজিয়ে দিল। সন্ধের মুখে স্বর্ণেন্দুকে নিয়ে রওনা হল ওরা। ঠাকুর, যাদব, কানাই এবং আর কে মিত্র কাঁধ দিয়েছেন। পরে তাঁকে সরিয়ে আর একজন এলেন। মেয়েরা যাচ্ছেন পেছন পেছন।

শ্মশানে যখন পৌঁছল তখন হালকা অন্ধকার। কে যেন বলল, 'কাল ঠিক এইসময় মানুষটা কবিতা শোনচ্ছিল। শোনামাত্র কেউ কেউ কেঁদে উঠলেন। চুপচাপ বসেছিল অবন্তী। কী দরকার ছিল স্বর্ণেন্দুর এখানে আসার? ও বলেছে জেনেশুনে আসেনি। কথাটা অবিশ্বাস করেনি অবন্তী। কিন্তু এই যোগাযোগ কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে? তা হলে তাঁর মতো নিষ্ঠুরতা কোনও মানুষ দেখাতে পারবে না। স্বর্ণেন্দু যদি না আসত। যদি অন্য কোথাও মারা যেত তা হলে জানতেও পারত অবন্তীযদি বা জানত তা হলে হয়তো একটু খারাপ লাগা তৈরি হত, তার বেশি কিছু নয়।

দীর্ঘকালের সম্পর্কহীনতা শোকের তীব্রতাকে ভোঁতা করে দেয়। কিন্তু এখানে এসে সে নতুন করে সব কিছুর জাগিয়ে দিয়ে গেল কেন! যে ছাই-এর স্তূপ পড়েছিল একপাশে তার তলা থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ খুঁজে বের করে হাওয়ার সামনে ধরার কী প্রয়োজন ছিল?

নলিনী মাসি, বনানী মাসিরা পাশে এসে বসলেন। এঁদের প্রত্যেকের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। সারাদিন খাওয়াও হয়নি অনেকের। পুজো করার কথা ভুলেও গেছেন অনেকে। নলিনী মাসি অবন্তীর হাত ধরলেন, 'আমাদের তো কেউ নেই রে, তুই আমাদের সব।'

অবন্তী তাকাল। সে অর্থ বোঝার চেষ্টা করছিল।

'তুই আমাদের মেয়ের মতো। মতো বা বলি কেন, মেয়েই। যাওয়ার সময় শেষ কাজটা তাই তোকেই করতে হবে মা।'

'কী বলছ?'

'লোকের মাতৃদায় পিতৃদায় দুবার হয়। তোর যে অনেক দায়। আমাদের শেষ দায়িত্ব তুই নিবি না?'

'কী করতে বলছেন আপনারা?'

দিব্যজ্যোতিবাবু বললেন, 'স্বর্ণেন্দুবাবু আমাদের চেয়ে বয়সে ঢের ছোট হয়েও আগে চলে গেলেন। তুমি সবচেয়ে বয়সে ছোট। ওঁর মুখাগ্নি তুমিই করো দিদিভাই।'

নলিনী মাসি বললেন, 'তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমিও মরতে পারব রে। জানব মুখাগ্নি করার জন্যে তুই আছিস।'

চিতা তৈরি। তার ওপর স্বর্ণেন্দুকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। অবন্তী কাছে এল। সবর্ণেন্দুর চোখ বন্ধ, মুখ যন্ত্রণার চিহ্ন নেই, ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি। ও হাসছে কেন? কেউ একজন এগিয়ে এল, হাতে জ্বলন্ত পাটকাঠী। বলল, 'একটু মুখে ঠেকিয়ে কাঠে ধরুন, বাকিটা আমরা করে দিচ্ছি দিদি।'

তৃষ্ণায় যাকে জল দিতে পারিনি, নিজেকে বাঁচাতে অথবা মারতে যাকে আঘাত করে সরিয়ে দিয়েছি এ আগুন তাঁর মুখে ছোয়ালে কোন বৈকুণ্ঠের দরজা খুলে যাবে? অবন্তী চোখ বন্ধ করল। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'মুখের দিকে যাচ্ছে না!'

একটি হাত তার কব্জির ওপর পড়ল। হরিধ্বনি উঠল।

চিতা নিভে গেলে অস্থি সংগ্রহ করে পুরোহিত বললেন, 'মা, যান, ওই পুকুরে এটা বিসর্জন দিয়ে ডুব দিয়ে নিন।'

সরাটা নিয়ে জলে নামলে অবন্তী। আঃ। কী শীতল স্পর্শ। এখন পৃথিবীর কোথাও স্বর্ণেন্দু নেই। এই শীতলতা তার জন্যে নয়। আরও এক গভীর শীতল রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে গেছে সে এতক্ষণে।

ডুব দিয়ে সিক্ত অবন্তী ওপরে উঠে এল। বৃদ্ধারা এগিয়ে এলেন গামছা হাতে। কেউ বললেন, 'ভেজা শাড়িতে যাবে কেন, শাড়ি পাল্টে নাও।'

হঠাৎই, সারাদিনে এই প্রথমবার কেঁপে উঠে কেঁদে ফেলল অবন্তী। জলের আড়ালে। দৃষ্টি অন্ধ। সে হাত বাড়াল, 'আপনারা কেউ আমাকে একটা থানকাপড় দিতে পারেন!'